হিমালয়-অভিযান

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কলিকাতা
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

সূচীপত্র

'শিশু-ভারতী' সম্পাদনার সময় বিদেশীয় দুর্গমযাত্রীদের জীবনী ও তাঁহাদের অভিযান বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়াছে, আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে কি দুর্গমের অভিযাত্রী কেহ নাই ? ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। এজন্য এবিষয়ে নানাভাবে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি এবং তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে সমুদয় অসমসাহসিক দুর্গমের যাত্রী বা Explorer-এর পরিচয় পাইয়াছি, এ-গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের কয়েকজনের অভিযান বিবরণ প্রকাশ করা হইল।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণেরা পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গ ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত, চীন, মধ্যএসিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়া যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি[illegible] তেমনি ঐসব দেশের লোকদের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচ[illegible] করেন। তাঁহাদের কয়েকজনের বিষয় মনিষী শরৎচন্দ্র দাশ তৎপ্রণীত "Indian Pundits in the Land of snow" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে সবিস্তারে জানিতে হইলে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি এবং চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান, ইউয়ান্‌চাং, ইৎসিং প্রভৃতির লিখিত ভ্রমণ বিবরণ পাঠ করিতে হয়। শরৎচন্দ্র তদীয় গ্রন্থে শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কুমারজীব, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা তিব্বতে, চীনে ও মধ্যএসিয়ায় গমন করিয়াছিলেন।

আমরা এই গ্রন্থে সর্ব্বজনবিদিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের তিব্বত-যাত্রা এবং কুমারজীবের দুর্গম অভিযানের বিষয় বলিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গম যাত্রীদের কয়েকজনের পরিচয় প্রদান করিলাম।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মণ্টগোমেরি (Captain Montgomerie R. E., F. R. S.) নামক ভারতীয় জরিপ বিভাগের (Indian survey office) একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী কয়েকজন ভারতবাসীকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিভাবে অভিযান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা "Pundit Explorers" নামে অভিহিত হন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলেন, যদিও ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত নামে আখ্যাত হইতেন। ইঁহাদের কথা বলিতে গিয়া Captain J. B. Noel তাঁহার লিখিত "Through Tibet to Everest" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "In 1860 Captain Montgomerie, an active officer of the Indian Survey, hit upon the idea of training certain intelligent Indians in the use of scientific instruments. They became known as the 'Pundit Explorers.' Thy were not all Hindus although styled Pundits." আতা মুহম্মদ (Ata Mahomed) "মোল্লা" (The Mullah) নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি সিন্ধু নদের উৎস-সন্ধানে গমন করিয়া অসাধারণ সাহসিকতার ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। আমরা এখানে তাঁহার লিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। মির্জা সুজা (Mirza Shuja) নামক পারস্যদেশবাসী মুসলমান

আফগানিস্থান ও পামির অভিযানে গমন করিয়া বোখারা (Bokhara) নগরে নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হন।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই সব দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের বিষয় জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয় নাই। এমন কি তাঁহাদের নামও প্রকাশিত হইত না। কল্যাণ সিংহ "A. K." এবং হরিরাম—যিনি এভারেষ্ট অভিযান করেন তিনি "M. H." নামে পরিচিত হন।

এই সব অভিযানকারীরা তাঁহাদের যাত্রাপথে প্রতি পদক্ষেপের সহিত জমির পরিমাপ করিতেন, দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর দূরত্ব, উচ্চতা, পথ-ঘাট, নদ-নদী, লোকজন, কৃষিক্ষেত্র, হ্রদ, এসব নানা বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং দুর্দ্দান্ত দস্যু-তস্করের হস্ত হইতে ও বিদেশী পর্য্যটক মাত্রেরই প্রতি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির তিব্বতীয় রাজপুরুষদের নিকট তীর্থযাত্রীরূপে আত্ম-গোপন করিয়া চলিতেন। রাত্রিবেলা প্রার্থনাচক্রের (prayer wheel) মধ্যে গোপনে সংগৃহীত তথ্য লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতেন। ফাঁপা লাঠির ভিতরে তাঁহাদের Boilingpoint thermometer থাকিত। নোয়েল সাহেব বলেন এই সব দুর্গম যাত্রীদের ভাগ্যে মিলিত..."only a few rupees a month. They were rewarded only when they returned—if they returned !" মাসিক সামান্য কয়েকটি টাকা মাত্র মিলিত শুধু তাঁহাদের ব্যয়ের জন্য আর যদি ফিরিয়া আসিতে পারিতেন তবে তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিত যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিক মাত্র! শারীরিক ক্লেশ, অনাহার, দস্যু তস্করের হস্তে নির্য্যাতন ইহাই হইত তাঁহাদের এইরূপ অভিযানের প্রাত্যহিক পুরস্কার।

এখানে এই সব পণ্ডিত দুর্গম-যাত্রীদের সকলের কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমরা দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান ও কুমারজীবের পরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গমের অভিযাত্রী পণ্ডিত কিষণ সিংহ, কিন্‌থাপ, লালা, শরৎচন্দ্র দাশ ও আতা মুহম্মদের বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য ভারতীয় অভিযানকারীদের বিবরণ প্রকাশ করিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

পণ্ডিত নৈনসিং (Nain Shing) ১৮৭৩-৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়-অভিযান করেন। তাঁহার পর্য্যটন বিবরণ নানা তথ্যে পূর্ণ। নৈনসিংহের লিখিত পর্য্যটন কাহিনী প্রকাশ করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। নৈনসিং আলমোরা জেলার মিলাম নামক গ্রামের গভর্মেণ্ট ভার্ণেকুলার স্কুলের (Government Vernacular) School) হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি Great Trigonometrical Survey বিভাগের অধ্যক্ষ কর্ণেল জে, টি, ওয়াকারের (Colonel J. T. walker, R. E.) উৎসাহে দুর্গমের যাত্রী হইবার অভিলাষী হইয়া তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে অভিযান করেন এবং বিবিধ আবিষ্কার দ্বারা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার সুভেন হেডিন্ (Sven Hedin) তাঁহার লিখিত "Trans-Himalaya" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নইনসিং মধ্য তিব্বতে যে হ্রদ আবিষ্কার করেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। হেডিন্ তাঁহার তিব্বত-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন "One of my aims was to find an opportunity of visiting one or

more of the great lakes in Central Tibet which the Indian pundit, Nain Sing, discovered in 1874, and which since then had never been seen except by the natives. During my former journey I had dreamt of discovering the source of the Indus, but it was not then my good fortune to reach. The mysterious spot had never been inserted in its proper place on the map of Asia—but it must exist somewhere." [Trans-Himlaya vol. I. pp. 2-3] অর্থাৎ আমার এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পণ্ডিত-অভিযানকারী নৈনসিং মধ্যতিব্বতে যে সব হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে সকল বৃহত্তম হ্রদের কয়েকটি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করা। ঐ সব হ্রদ তিব্বতীয়েরা ব্যতীত বিদেশীয় পর্য্যটকদের মধ্যে নৈনসিং ভিন্ন অপর কেহ দেখিতে পারেন নাই। নৈনসিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে। আর সিন্ধু নদের উৎস সন্ধানে মোল্লা আতা মুহম্মদ ভারতীয়-দের অসাধারণ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কিন্‌থাপ সম্বন্ধে কাপ্তেন নোয়েল সাহেব বলেন ;"One of the most romantic of all these adventures was that of the Pundit Kinthup. He was sent to trace the courses of the great Tibetan river, the Tsanpo and to find out if it was the same stream as the Brahmaputra which pours into India from the Himalayas through the impenetrable forests of the Abor savages."

কিন্‌থাপ ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিযান ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিব্বতীয়দের হস্তে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, সঙ্গী চৈনিক লামা কর্ত্তৃক ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া-

ছিলেন এবং নানারূপ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া কিন্‌থাপ দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অভিযান বিবরণ প্রথমে অনেকে অলীক বলিয়া মনে করেন কিন্তু ভারতীয় জরিপ বিভাগ বিবিধ প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারেন যে তাঁহার অভিযান বিবরণ অসত্য নহে। [The story he gave of his wanderings was so romantic that many disbelieved him, but the Survey Department trusted his account officially ; and. indeed, later his discoveries were proved true. Kintup received just reward for his devotion. The Geographical Society honoured him, while the Indian Government gave him Order of Commander of the Indian Empire and a gift of a prosperous village where he could spend the remainder of his days.] ভৌগোলিকসমিতি এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দুঃসাহসিক অভিযানকারীকে তাঁহার অভিযানের পুরস্কারস্বরূপ সি, আই, ই উপাধি দান করেন এবং একখানি গ্রাম জায়গীরস্বরূপ দিয়াছিলেন। কিন্‌থাপ তাঁহার শেষ জীবন এইভাবে নিরাপদে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

‘এভারেষ্ট—অভিযান’ সম্পর্কে কোনও কল্পনা যখন ইউরোপীয় ভৌগোলিক সমিতি করেন নাই, সে সময়ে হরিরাম বা “M. H.” পর্য্যটকরূপে এভারেষ্ট অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের অন্তর্গত কোশি নদীর পথে অগ্রসর হইয়া, এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০,০০০ ফিট উচ্চ দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী গিরিশ্রেণীর উত্তর দিকের দিঙ্গ্রি (Dingri) নামক স্থানে উপনীত হন। এভারেষ্টের উত্তরাংশের অভিনব ভৌগোলিক বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মুখস্থ দুরধিগম্য তুষারমৌলি

বিরাট গিরি-শ্রেণীর জন্য আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। হরিরাম দিঙ্গ্রিতে গিয়া লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে দূরবর্ত্তী বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গের মধ্যেও বৌদ্ধমঠ (Lamasery of the snows) আছে।

হরিরাম ও শরৎচন্দ্র দাশ এই দুইজন নির্ভীক ও দুঃসাহসিক পর্য্যটক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট অভিযান করিয়া ভারতীয় অভিযানকারীদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে নোয়েল সাহেব বলেন: 'This journey of "M. H." and that of Sarat Chandra Das in 1879 were the nearest foreign approaches made to Mount Everest. Sarat Chandra Das made a journey to satisfy a religious ambition, travelling from India to Lhasa. He was not a trained geographer and his account of the country along the eastern approaches to Mount Everest was vague, but interesting as showing the hardships of travel over high mountain lands. He wrote a delightful book, **Journey to Lhasa and Central Tibet** (John Murray, 1902). যতদূর জানা যায় ভারতীয়দের মধ্যে হরিরাম ও শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম এভারেষ্ট-অভিযান করেন তাঁহাদের পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। সম্প্রতি অনুসন্ধানে শরৎচন্দ্রের লিখিত এভারেষ্টের পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ যথার্থরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রমপূর্ব্বক গিয়ানসুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাসিচোডিং নামক মঠে উপনীত হন। সেখান হইতে নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী প্রায় ২০,০০০ হাজার ফিট উচ্চ চাথাংলা গিরিসঙ্কট পথে জেমু নদীর খালভূমিতে উপনীত হন। আমরা ঐ

দুর্গম অভিযানের বিবরণ "Journal of the Budhist Text and Anthropological Society র প্রকাশিত পত্রিকার Vol. VII, 1899 হইতে সঙ্কলন করিয়াছি।

"A Lay Of Lachen" নামক কবিতায় মাননীয় কোলম্যান্ ম্যাকলে [Late Hon'ble Colman Macaulay] শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

...Sarat Chandra, hardy son
Of soft Bengal, whose wondrous store
Of Buddhist and Tibetan lore
A place in fame's bright page has won,
Friend of the Tashu Lama's line,
Whose eyes have seen, the gleaming shrine,
Of holy Lhassa came to show
The wonders of the land of snow."

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত কেবল বিদেশী পর্য্যটকগণের অভিযান বিবরণই পড়িয়া আসিয়াছি। লিভিংষ্টোন্, আয়ার, বার্ক, ষ্ট্যান্লি, স্ভেন হেডিনের আবিষ্কার ও দুঃসাহসিক অভিযানের আখ্যায়িকাই আমাদের বালকবালিকারা এবং তরুণ-তরুণীরা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এই ভারতীয় বীরেরা, এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া ও সিন্ধুনদের এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস-সন্ধানে গিয়া নানাদেশ, নানা অপরিজ্ঞাত জাতি, হ্রদ, নদী ও বিভিন্ন দেশের যে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহাত আমরা জানিতাম না।

আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজা রামমোহন রায় তিব্বত গমন করেন। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের অনেক ঐতিহাসিক সন্দিহান ছিলেন, সম্প্রতি বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি. লিট (অক্সন), পি-এইচ-ডি মহাশয় দিল্লীর দপ্তরে

এমন অনেক পুরাতন দলিলপত্র পাইয়াছেন যাহা হইতে রামমোহনের ভোট দেশও তিব্বত গমন সম্পর্কেও নূতন নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। তিনি শীঘ্রই ঐ সমুদয় চিঠিপত্র ও দলিল ইত্যাদি সবিস্তারে প্রকাশ করিলে রামমোহনের তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কিত বিবরণ ও ভবিষ্যতে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে।

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি বিশেষভাবে ভারতীয় জরিপ বিভাগের নিকট ঋণী। আমি তাঁহাদের নিকট নানাভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে পণ্ডিত কিষণসিংহ, লালা, কিন্‌থাপ, মোল্লা আতা মুহম্মদ প্রভৃতি সম্পর্কিত কাগজপত্র বা সরকারী মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য বিবরণী (Reports of the Trans-Himalayan Exploration, 1878, 1878-79) এমন কি তাঁহাদের অফিসের একমাত্র 'Reference copies' পর্য্যন্ত সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেরাদুনে অবস্থিত ভারতীয় জরিপ বিভাগের Geodetic Branch এর ডাইরেক্টারের নিকট হইতেও প্রয়োজনীয় বিবরণী পুস্তিকা, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি জরিপ বিভাগ আনাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে ভারতীয় এইসব অপরিজ্ঞাত দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না।

কলিকাতা Royal Asiatic Societyর পুস্তকালয় হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এবং পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি মহোদয়। এইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর গুপ্ত, এম্-এ আমাকে

বহু ইউরোপীয় অভিযানকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া ও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন।

আমি যথাযথরূপে এই সব অভিযানকারীদের বিবরণ ইংরাজী ভাষায় লিখিত সরকারী বিবরণী হইতে সঙ্কলন করিয়াছি। আশা করি ইহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইবে।

যাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের ভ্রমণ-বিবরণী পাঠে আগ্রহান্বিত তাঁহারা আমার এই হিমালয়-অভিযান কাহিনী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলেই উপকৃত হইব। আমি যথাসাধ্য সরল ভাষায় এই অভিযান-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আশা করি এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবে।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৪৮। **শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত**

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ "হিমালয়-অভিযান" ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের "দ্রুত পঠনের" জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮। **শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত**

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

—রবীন্দ্রনাথ



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

হিমালয়-অভিযান

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের তিব্বত-যাত্রা

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে বিখ্যাত তিব্বত-পর্য্যটক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তিন জন তিব্বতীয় লামা সেখানে বসিয়া আছেন। শরৎবাবুর সহিত পরিচিত হইলে পর তিনি তিব্বতীয় ভাষায় ঐ লামা তিনজনকে কি বলিলেন বুঝিলাম না, তবে দেখিলাম তাঁহারা আমার প্রতি চাহিয়া অতি বিনীতভাবে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। আমার বয়স তখন অল্প, এমন কোনও কৃতিত্বও

নাই যে আমার প্রতি এই তিব্বতীয় লামারা এতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন।

শরৎবাবু আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই হাসিয়া বলিলেন—'আপনি বিক্রমপুরের অধিবাসী, লামাদিগকে আমি সে পরিচয় দিয়াছি বলিয়াই তাঁহারা দীপঙ্করের স্বদেশবাসী বলিয়া আপনাকে এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিলেন। আমাকেও সুদূর তিব্বত ও চীন প্রবাসে দীপঙ্করের স্বদেশবাসী বলিয়া সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন।' শরৎ বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী বলিয়া আমার হৃদয় গর্ব্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইল।

সেই কবে কত শত বৎসর পূর্ব্বে একজন মানুষের মত মানুষ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়-অভিযান করিয়াছিলেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কথায় সমস্ত বাঙ্গালী ও ভারতবাসী গৌরব বোধ করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে—বৌদ্ধজগতে দীপঙ্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কবির কথায় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে :

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের প্রদীপ—তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

আমাদের দুর্ভাগ্য তাই দীপঙ্করের নামও ভুলিতে বসিয়াছি।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের তিব্বত-যাত্রা

দীপঙ্করের কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার জীবনী-লেখক শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষাগুরু, যাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট্ আজিও সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সার্দ্ধ আট শত বৎসর পরে এ-কথা স্মরণ করিলেও ক্ষীণ প্রাণ বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয় এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে; তখনই বর্ত্তমান বঙ্গভূমি ছাড়িয়া মন সহসা অতীত বঙ্গের সেই অমরাবতীতে উপস্থিত হয় এবং অধঃপতিত দেশের দুরবস্থা ভুলিয়া ভূত সৌভাগ্যের সেই দেবোদ্যানে বিচরণ করিতে থাকে।"

আমরা বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে দীপঙ্কর আনুমানিক ৯৮০ কিংবা ৯৮২-৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশের বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দীপঙ্কর যে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সে অংশ বজ্রযোগিনী নামে আখ্যাত ছিল। 'দেশাবলীবিবৃতি' নামে একখানি সপ্তদশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে বজ্র-যোগিনীকে 'বরদযোগিনী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এবং সমগ্র ঢাকা জেলাকেই বরদযোগিনী দেশান্তর্ভুক্ত রূপে বর্ণনা

করা হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ এখনও মুখে মুখে বজ্রযোগিনী না বলিয়া বলে—বদরযোগিনী বা বরদযোগিনী। *

দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। দীপঙ্কর যখন বালকমাত্র তখন তাঁহার শিক্ষার জন্য জেতারি নামে একজন অবধূতের নিকট প্রেরণ করা হয়। জেতারির নিকট দীপঙ্কর বর্ণ শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

দীপঙ্কর তাঁহার আত্মকথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে (ভারতে) রাজা এবং রাজবংশীয় লোকেরা বাস করেন। সে সময়ে বাঙ্গলাদেশে ভূ-ইন্দ্রচন্দ্র নামে এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজবংশীয়দের দেহে রাজরক্ত থাকিলেও তাঁহারা রাজ্য বা সিংহাসনের অধিকারী নহেন। আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার পিতা গৃহস্থ উপাসক ছিলেন তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণী এবং আর একজন ছিলেন ক্ষত্রিয়াণী। আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলাম।

* *Desavalivivriti* written by Jaganmohaua Pandita, under the patronage of Vijjala Bhupatia Chauhan Raja of 4 parganas round Patna in the 17th centary.........Varadayogini desa-nirnaya. It calls the district of *Dacca* as Varadayogini. Il begins : অথ বরদযোগিনী দেশ বর্ণনম্ ইত্যাদি।

আমার মাতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি শৈশবকালে আমাকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।" কাজেই দীপঙ্করের বাল্য জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা যে উত্তমরূপে তাঁহার মাতার নিকট হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা দীপঙ্করের নিজের উক্তি হইতে বুঝিতে পারিতেছি।

দীপঙ্করের বাল্য জীবনেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাঁহার প্রতিভারও বিকাশ পাইতে লাগিল। জেতারি তাঁহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য পরম পণ্ডিত শীলরক্ষিতের নিকট হইতে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ করেন।

অল্প সময় মধ্যেই দীপঙ্কর অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁহার যশঃ দেশ-বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিল। দীপঙ্করের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য পণ্ডিতেরা সব ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া 'অবনত মস্তকে' দেশে প্রত্যাগমন করিতেন। দীপঙ্করের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসীম গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার

পরেই দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বা ওদন্তপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট হইতে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ আচার্য্যগণের নিকট সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন।

ভিক্ষু হইবার পর দীপঙ্কর বিক্রমশীলা বিহারে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের নিকট প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরও অধিক শিক্ষা লাভের জন্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। কিছুতেই যেন তিনি অন্তর মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

সে সময়ে সুবর্ণদ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি সেখানকার প্রধানতম আচার্য্য ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন মনীষী ব্যক্তি। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহার নিকট যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এবং এক শুভদিনে একখানি বৃহৎ নৌকা বা সেকালের জাহাজে আরোহণ করিয়া কয়েকজন বণিকের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপের দিকে

যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড তরণী প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিল। পথিমধ্যে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটিল, অবশেষে প্রায় তের মাস সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরে তাঁহাদের তরণীখানি আসিয়া সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হইল। দীপঙ্করের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

দীপঙ্কর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল সুবর্ণদ্বীপে থাকিয়া, সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানলাভ করিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি পুনরায় কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি বৃহৎ অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় পথে তিনি একে একে তাম্রদ্বীপ ও অরণ্য-দ্বীপ প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিলে পর মগধের বৌদ্ধেরা দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মজ্ঞানে ও চরিত্র-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। রাজা নয়পাল তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলা বিহারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীলা হইতে লেখাপড়া শিখিয়া শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলা বিহারের রত্নাকর-শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, কাশ্মীর-নিবাসী রত্নবজ্র, গৌড় নিবাসী জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন।

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীশের) জীবন-চরিত হইতে জানা যায় যে নয়পালের রাজত্বকালে "কর্ণ" রাজ্যের রাজা মগধ আক্রমণ করেন। নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়সেনা 'কর্ণ' রাজ্যের সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল এবং শত্রুগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় কিন্তু পরে নয়পাল জয়লাভ করেন। অবশেষে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয় পক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল।

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হইলেন সে সময়ে সেখানে ৫৭ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বিক্রমশীলা বিহার যেরূপ বৃহৎ ছিল, তেমনি তাহার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এই বিহারের সম্মুখস্থিত প্রাচীর গাত্রের দক্ষিণদিকে নাগার্জ্জুনের মূর্ত্তি চিত্রিত ছিল এবং বাম পার্শ্বে স্বয়ং দীপঙ্করের

মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে দীপঙ্করকে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, নাগার্জ্জুনের সহিত সমান মর্য্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এবং তিনি সাধারণের নিকট কিরূপ সম্মানিত ছিলেন তাহাও ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। সেই বিহারের আর এক দিকের প্রাচীর গাত্রে প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের আলেখ্য অঙ্কিত ছিল, এবং সিদ্ধাচার্য্য-গণের মূর্ত্তির চিত্রও তাহাতে ছিল।

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতেন সে সময়ে তিনি বিহার ও মন্দিরের চাবি নিজের কাছে রাখিতেন। অতীশের আঠারোটী চাবি রক্ষা করিতে হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে সে সময়ে অষ্টাদশটি বিহার ও মন্দির বিক্রমশীলা বিহারের অন্তর্ভূ'ত ছিল। দীপঙ্কর আঠারোজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে অধ্যাপনার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পরও তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিহারে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ সোমপুরী বিহারে কিছুদিনের জন্য তিনি বাস করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তেঙ্গ্যুরের ক্যাটালগ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধ-

শাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াও তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি লামাও তাঁহাকে "অতীশ" (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। তৎকালে থোলিং নগরে লামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধনীতির সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিহারে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ-সকাশে তাঁহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচারকের সহিত একজন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া, রাজদূত বিক্রমশীলায় উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত শত অনুনয়-বিনয়, সহস্র প্রলোভন সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে ভুলাইতে পারিল না।

দীপঙ্কর কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। তিনি বিনীত-ভাবে বলিলেন—"আমার সোণার দ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সোণা দিয়া কি করিব?" তিনি আরও বলিলেন, "আমাকে দুইটী কারণে তোমরা তিব্বতে লইয়া যাইতে চাহিতেছ—প্রথমতঃ সুবর্ণ প্রাপ্তির লোভ, দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধদেবতারূপে পরিগণিত হইবার জন্য—ইহার একটির প্রতিও আমার আকর্ষণ নাই। কাজেই আমি আমার তিব্বত-যাত্রার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না।" রাজদূত দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া বিষণ্ণ মনে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

রাজা লামা জে-সে-হোড রাজদূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম্ম-সংস্কার করিবার জন্য অতি মাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা জে-সে-হোড বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাং-চুব রাজপদ গ্রহণ করিলেও তিনি সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন।—চ্যাং-চুব রাজা হইয়াই এক ধর্ম্মসভার আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তিব্বতের ঐ অঞ্চলের যত সব ধার্ম্মিক শ্রমণগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইতেছেন যে আমাদের দেশে ধর্ম্মের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছে। স্বর্গত মহারাজ ধর্ম্মের

সংস্কারের জন্য পূর্ব্বে যে তেরোজন পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন তাঁহারাও এখানে ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিতে পারেন নাই। এইরূপ স্থলে যেরূপেই হয়, স্বর্গীয় মহারাজার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। উপস্থিত শ্রমণগণ সকলেই নৃপতি চ্যাং-চুবের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই সভায় বিনয়ধর নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উপস্থিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইঁহার পরিচয় ছিল। বিনয়ধরের বয়স তখন সাতাইশ বৎসর মাত্র ছিল। রাজা চ্যাং-চুব বা বানচুর বিনয়ধরকে বলিলেন—"তুমি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছ। সে দেশের উষ্ণ জলবায়ুর সহিত তুমি পরিচিত, অতএব তুমিই দীপঙ্করকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য গমন কর। যদি তিনি একান্তই না আসেন তবে তাঁহার পরবর্ত্তী যিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

বিনয়ধর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে মঠে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা এবং ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু নৃপতি চ্যাং-চুব বিশেষ ভাবে অনুজ্ঞা দেওয়ায় তিনি রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য

হইলেন। রাজা তাঁহার সহিত এক শত জন অনুচর দিতে চাহিলেন, কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজা তাঁহাকে অনেক স্বর্ণ দিলেন। সেই স্বর্ণের মধ্য হইতে কতক দীপঙ্করকে উপঢৌকন স্বরূপ, কতক বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, কতক বিনয়ধরের যাতায়াতের ব্যয় বাবদ এবং কতক একজন দোভাষীর জন্য।

বিনয়ধর নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দস্যু-তস্করের হাতে বিড়ম্বিত হইয়া এবং নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম-পূর্ব্বক বিক্রমশীলা বিহারে আসিতে হইয়াছিল।

সে সময়ে বিনয়ধরের অধ্যাপক তিব্বত দেশীয় গ্যায়ৎসো তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য বিক্রমশীলা আসিয়াছেন সে কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। তখন গ্যায়ৎসো তাঁহাকে বলিলেন যে—একথা এই বিহারের কাহারও নিকট কোন ক্রমেই এখন প্রকাশ করিবেন না। কেন না দীপঙ্কর এই বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি এই বিহার পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা এখানকার কাহারও অভিপ্রেত নহে। আপনারা এই বিষয়টি গোপন রাখিয়া এই বিহারে অবস্থান করুন এবং মহাস্থবির রত্নাকরকে যথোপযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক এই বিহারের শিষ্যরূপে অবস্থান

করিতে থাকুন। তারপর যদি আপনাদের ব্যবহার দ্বারা মহাস্থবিরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে অতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে। বিনয়ধর গ্যাৎসোর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যাপকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন।

বিক্রমশীলা বিহারে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সেখানে প্রায় আট হাজার ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে বিনয়ধর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দীপঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর কয়েকদিন পরে সুযোগক্রমে দীপঙ্করের নিকট ভক্তি-প্রণত-মস্তকে, বিনয়সহকারে তাঁহাদের রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দীপঙ্কর ধৈর্য্যসহকারে সব কথা শুনিলেন। তিব্বত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা অবনতির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল।

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা

এইবার দীপঙ্কর মনঃস্থির করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট বলিলেন—"আমি তিব্বতীয় শিষ্যগণের সহিত

তীর্থদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকেন ইহাই ভগবান্ তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।" রত্নাকরও তাঁহার সহিত তীর্থ-যাত্রার অভিলাষী হইলেন। রত্নাকরের এই কথায় দীপঙ্কর নীরব রহিলেন। রত্নাকর বলিলেন—"দীপঙ্কর, আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি অষ্ট পুণ্যস্থান দেখিবার ছল করিয়া বিনয়ধর (নাগ-চো), গ্যায়ৎসো এবং তাঁহাদের সঙ্গী অন্য পাঁচজন শ্রমণের সহিত তিব্বত-যাত্রার অভিলাষী হইয়াছ। একবার আমি তোমার যাইবার পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়াছিলাম। এইবারও যদি তোমার যাইবার কথা কোনরূপে নৃপতির কর্ণে গিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে তোমার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না বিশেষ এই দুইজন তিব্বতীয় ভিক্ষুরও জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইঁহাদের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। তারপর ইঁহারা তিব্বতীয় মহারাজার নিকট হইতে যে মহদুদ্দেশ্যের বার্ত্তা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এইরূপ স্থলে আমি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কি করিব তবে আমি তিন বৎসরের জন্য তোমাকে যাইতে দিতে পারি।"

মহাস্থবির রত্নাকরের এই অভিপ্রায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা বিহারের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বিহারের ভিক্ষুগণ,

অধ্যাপকগণ সকলেই দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দীপঙ্করের প্রাণে নবীন উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতের মৃত মহারাজার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি তিব্বত-যাত্রার জন্য আয়োজন ও উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিব্বতের রাজার প্রেরিত স্বর্ণ, দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগ দিলেন বিক্রমশীলার অধ্যাপকদিগকে, অপর একভাগ দিলেন স্থবির রত্নাকরের হাতে, তৃতীয় ভাগ তিনি বজ্রাসন বিহারের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন আর চতুর্থ ভাগ রাজভাণ্ডারে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যেন এই স্বর্ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হয়।

তারপর আসিল একদিন বিদায় মুহূর্ত্ত। সে সময়ে বিক্রম-শীলা বিহারের শ্রমণগণ অধ্যাপকগণ ও শিষ্যগণ সকলে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীপঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপঙ্কর সেই স্তব্ধ ও শোকাকুল জনতার দিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

দীপঙ্করের মনে পড়িল—বিক্রমশীলা বিহারের শত স্মৃতি। মনে পড়িল প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি যখন বিহারের বাহিরে আসিতেন, তখন ভিখারী বালকগণ করুণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছোট ছোট হাতগুলি বাড়াইয়া বলিত, "বাবা, ভিক্ষা দে!

বাবা ভিক্ষা দে!" মনে পড়িল কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তিনি এই বিহারের প্রধান আচার্য্যরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন কি দিবাকরচন্দ, রামপাল প্রভৃতির ন্যায় শিষ্যদিগকেও বিক্রমশীলা বিহার হইতে তাঁহাদের অপরাধের জন্য বিতাড়িত করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই।

আজ সেই কীর্ত্তিক্ষেত্র বিক্রমশীলা বিহার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে তাঁহার প্রাণে যে কত বড় ক্লেশ বোধ হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দীপঙ্কর বুঝিতে পারয়িাছিলেন যে বিহারের শ্রমণগণ, শিষ্যগণ, কেহই তাঁহাকে তিব্বতের ন্যায় দুর্গম প্রদেশে যাইতে দিতে সম্মত হইবেন না। এই জন্যই "অষ্ট মহাস্থান" * দেখিবার ছল

* বৌদ্ধদের অষ্ট 'মহাস্থান' বা তীর্থস্থান হইতেছে (১) লুম্বিনী উদ্যান (বর্ত্তমানে নেপাল তরাইস্থিত রুমিনদেই) বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন। (২) বুদ্ধগয়া এইস্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (সম্যক্ সম্বুদ্ধ) লাভ করিয়াছিলেন। গয়া সহর হইতে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। (৩) মৃগদাব (Deer-park, বর্ত্তমান সারনাথ)। বুদ্ধদেব 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ' এই পদ প্রাপ্তির পর ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেকার পাঁচজন শিষ্য মৃগদাবে (সারনাথে) আছেন। ইহা জানিয়া তিনি সারনাথে আসিয়া আপনার ধর্ম্মোপদেশ প্রথমে ঐ পাঁচজনকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন" নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এইখানেই তিনি তাঁহার সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সারনাথের প্রাচীন নাম 'ইসিপতন মিগদাব।' সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি যাদুঘরও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। (৪) কুশীনারা (বর্ত্তমান কাশিয়া বা কুশীনগর) ইহা মল্লদিগের নগর ছিল। মল্লদের শালবনে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। (৫) জেতবন-শ্রাবস্তীর নিকট

করিয়া তাঁহাকে বিহার হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই তীর্থযাত্রা যে তিব্বত-যাত্রা তাহা বিক্রমশীলা বিহারের সকলেই কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল। কাজেই তাঁহার যাত্রাকালে সকলের প্রাণেই একান্ত গভীর বেদনা ও দুঃখ সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রাণ দীপঙ্কর তাঁহার বয়স ও পথের দারুণ ক্লেশের কথাও বিস্মৃত হইলেন, যখন তাঁহার মনে পড়িল পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তিব্বতে কি দারুণ অবনতিই না হইয়াছে! তখন তাঁহার মনে হইল—ধর্ম্মপ্রাণ রাজ-সন্ন্যাসী জে-সে-হোড্ তাঁহাকে তিব্বতে নিবার জন্য ব্যর্থ মনোরথ হইয়াই প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রাকালে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১০৪২ খ্রীঃ অঃ ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন। * এল. এ. ওয়াডেল [L. A. Waddell] সাহেবের

(বর্ত্তমান সাহেৎ মাহেৎ) এখানে বুদ্ধদেবের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল। (৬) বৈশালী (বসার) এখানে একটি হনুমান বুদ্ধদেবকে ভোজন করাইয়াছিল। (৭) সাঙ্কাস্য (বর্ত্তমানে সাঙ্কিসা) এখানে তিনি বিমান হইতে অবতরণ করেন। (৮) রাজগৃহ, বর্ত্তমান রাজগীর—এখানে তিনি একটি বন্য হস্তীকে দমন করিয়াছিলেন।

* *Antiquities of Tibet*, Pt. I, by A. H. Francke, pp. 50-52. In A.D. 1013, the Indian Pandit Dharmapala came to Tibet with several of his disciples, and in 1042 the famous ATISHA, a native of Bengal, who is known in Tibet as Jo-Vo-rje or Jo-Vo-rtishe, also came here. *The Life of Buddha.* Translated by W. W. Rockhill, p. *227*, 1884.

মতে দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রীঃ অঃ তিব্বতে গমন করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স ৫৮-৫৯ বৎসর ছিল। রক্‌হিল সাহেবও দীপঙ্কর ৫৯ বৎসরে তিব্বতে গমন করেন সেই কথা বলিয়াছেন। তবে তাঁহার হিসাব মানিয়া লইতে হইলে দীপঙ্করের জন্ম ৯৮৩ খ্রীঃ অঃ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু আমরা তিব্বতের ইতিহাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে অর্থাৎ আসন্ন ষাট বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন তাহাই প্রামাণিক রূপে পাইতেছি। তাঁহার জন্মের বৎসর স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের মতে ৯৮০ খ্রীঃ অঃ। ইহাই এতদিন কিন্তু প্রামাণিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল। অতীশের জন্ম ৯৮২ বা ৯৮৩ খ্রীঃ অঃ হউক না কেন, তিনি যে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহের কারণ নাই। তবে কোন্ সময়ে গিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয় অধিকাংশ লেখকই যখন অতীশ ১০৪২ খ্রীঃ অঃ তিব্বত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন, তখন আমরাও ১০৩৮ খ্রীঃ অঃ এর পরিবর্ত্তে ১০৪২-৪৩ খ্রীঃ অঃ তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন সে কথাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অতীশের তিব্বত-যাত্রার সঙ্গী হইলেন পণ্ডিত ভূমিসঙ্ঘ, বীর্য্য-চন্দ্র, নাগ-ছো, গ্যায়ৎসো এবং অনেক অনুচর ও ভৃত্যমণ্ডলী

তাঁহারা যাত্রাপথে প্রথমে মিত্রবিহারে আসিলেন। সেই বিহারের শ্রমণগণ এই যাত্রীদলকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা অতীশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই বিহার হইতেই তাঁহারা তিব্বতের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলেন। গ্যায়ৎসোর সঙ্গে ছিল তুইজন ভৃত্য, নাগ-ছোর সহিত ছিল ছয়জন এবং অতীশের সঙ্গে ছিল কুড়িজন অনুচর। তাঁহারা চলিতে চলিতে ক্রমে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি ছোট বিহার ছিল—সেই বিহারের শ্রমণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অতীশ এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থিত এই শ্রমণগণ আপনাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন: "যদি অতীশের এই তিব্বত-যাত্রা আমরা প্রতিরোধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত, কেননা আমরা ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে অতীশের ন্যায় একজন মহাপণ্ডিতের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইবে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে মহাপণ্ডিত আচার্য্য অতীশকে তাঁহার তিব্বত-যাত্রার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করা। আবার সঙ্ঘের অন্যান্য শ্রমণেরা বলিলেন: "বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য্যগণ যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে

পারেন নাই তখন আমাদের এইরূপ চেষ্টা করা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ।"

বিহারের শ্রমণগণ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখিলেন।

অতীশ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তীর্থিকদের গন্তব্যস্থল অতি পবিত্র একটি বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেস্থানে অতীশের মতাবলম্বী পঞ্চদশজন বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেছিলেন। এই আশ্রমের আচার্য্যগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। সারাদিন অতীশের সহিত তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা করিলেন। অতীশ তাঁহাদিগকে এইরূপ সরলভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন যে সেই আশ্রমবাসী শ্রমণগণ অতীশের পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইয়া প্রত্যেকে তাঁহাকে একটি ছত্র উপহার দিলেন। তাঁহারা অতীশের সহিত একান্ত অনুগতের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পার্ব্বত্য-পথে চলিতে লাগিলেন। এই পথে অনেক তীর্থিকেরাও তাঁহাদের সঙ্গী ছিল। তীর্থিকদলের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, কপিলাশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিল। ইহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও সংস্কারের পক্ষপাতী

ছিল না। এই তীর্থিকদলের মধ্যে কেহ কেহ অতীশকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। একবার তাহারা আঠারো জন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করে, কিন্তু সেই দস্যুগণ অতীশের সৌম্য, শান্ত ও জ্যোতিষ্মান্ মুখশ্রী দেখিয়া এমনভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল—প্রস্তর মূর্ত্তির মত সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতীশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'আমার এই হতভাগ্য দস্যুদের জন্য দুঃখ হইতেছে!' এইরূপ বলিয়া তিনি মাটির উপর কয়েকটি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যেমন মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন অমনি নির্ব্বাক্ ও অচল দস্যুদল আবার বাক্‌শক্তি লাভ করিল এবং চলিতে সক্ষম হইল।

একদিন পথিমধ্যে এক স্থানে অতীশ দেখিতে পাইলেন, তিনটি কুকুরের বাচ্চা শীতে জড়সড় হইয়া কষ্ট পাইতেছে। কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। অতীশ কুকুরের বাচ্চা তিনটিকে তুলিয়া তাঁহার গাত্রাবরণের মধ্যে লইলেন এবং বলিলেন—'আহা! বাছারা, তোমরা বড় কষ্ট পাইতেছ!' এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি ছিল তাঁহার দয়া ও মহত্ত্ব।

এ স্থানের রাজা (জমিদার) এই যাত্রীদলের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত চন্দন কাষ্ঠের

নির্ম্মিত একটি ছোট টেবল্ (table) ছিল। রাজা দীপঙ্করের নিকট সেই টেবলটি অভদ্রভাবে দাবী করিলেন। অতীশ বলিলেনঃ "আমি তিব্বতের রাজাকে উপহার দিবার জন্য এই টেবলটি লইয়া যাইতেছি। আমি ইহা কোন প্রকারেই হস্তান্তরিত করিতে পারিব না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য পথে এক দস্যুদলকে পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা পরদিন প্রত্যূষে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ যেমন এ পথ দিয়া যাইবেন, সে সময়ে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তাঁহাদের প্রাণনাশ করে।

পরদিন প্রত্যূষে রাজা যেমন যাত্রীদলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন দীপঙ্কর তাঁহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সতর্ক থাকিবে। আজ পথে পাহাড়িয়া দস্যুরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহাই হইল,—কিন্তু অতীশের মন্ত্র-প্রভাবে তাহারা নির্ব্বাক্‌ভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় চলিয়া গেল।

এইবার তাঁহারা নেপালের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে পুণ্য পীঠস্থানের আর্য্য স্বয়ম্ভুর মন্দির দেখিয়া তাঁহাদের মন ও প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট শ্যামল-পত্ররাজি-শোভিত বিরাট বৃক্ষের নীচে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইখানে ভারবাহী

জন্তুর পৃষ্ঠ হইতে মালপত্র নামানো হইল। আর্য্য-স্বয়ম্ভুরমন্দির দর্শনে দীপঙ্করের প্রাণ এতদূর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল যে তিনি অপলকনেত্রে সেইদিকে তাকাইয়াছিলেন। অতীশ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে গ্যায়ৎসো এবং বাম দিকে বসিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র। আর মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন রাজসন্ন্যাসী মহারাজা ভূমিসঙ্ঘ। এই ভূমিসঙ্ঘ অতীশের প্রিয়তম শিষ্য।

এস্থানের নৃপতি অতীশকে সদলবলে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার ও তদীয় সঙ্গিগণের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থার জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর ভার দিলেন। মগধের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে নৃপতি অনন্তকীর্ত্তি অনেকদূর হইতেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া তাঁহার থাকিবার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে সম্মুখে উপবেশন করিয়া আচার্য্য অতীশের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে গ্যায়ৎসো কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। গ্যায়ৎসোকে আরোগ্য করিবার সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। একদিন গভীর রাত্রিতে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। অতীশের অনুচরগণ অতিগোপনে রাত্রিকালেই নদীর তীরে লইয়া যাইয়া তাঁহার দেহের সৎকার করিল। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রাকালে গ্যায়ৎসোর পরিত্যক্ত

শয্যাদ্রব্যাদি একটা ডুলির মধ্যে এমনভাবে সাজানো হইল যেন লোকে মনে করে যে পীড়িত গ্যায়ৎসো ডুলিতে চড়িয়া যাইতেছেন। পাছে নেপাল সরকার কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করে এজন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা অনাবশ্যকভাবে যাত্রা-পথে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিত।

নেপালে অবস্থান কালে অতীশ, নৃপতি নয়পালকে একখানি উপদেশপূর্ণ লিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপিখানি 'বিমলরত্নলেখ' নামে পরিচিত। অতীশ তাঁহার সঙ্গীয় দ্বিভাষীর সাহায্যে ঐ সুন্দর উপদেশপূর্ণ পত্রখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এইবার পুনরায় অতীশ ও তাঁহার সহযাত্রীগণ নেপাল পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিলেন।

অতীশ ও তাঁহার অভিযাত্রীদল যখন তিব্বতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন রাজা চ্যাং-চুবের প্রেরিত একশত অশ্বারোহী পুরুষ কারুকার্য্য-পরিশোভিত শ্বেতপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। তাঁহাদের নাম লা-ওয়াংপো, লা-লো দোই, লা-সিরাব এবং লা-শে-জোন্‌ ইঁহাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ষোলটি করিয়া বর্শা। বর্শার উপরে ছিল শ্বেতপতাকা। অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হস্তে

ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতপতাকা এবং কুড়িটি শ্বেত সাটিনের ছত্র। ইঁহারা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চারিদিক নিনাদিত করিয়া—"ওঁ মণিপদ্মে হুম" এই পবিত্র মন্ত্র গান করিতে করিতে মগধের বিখ্যাত আচার্য্য দীপঙ্করকে রাজা চ্যাং-চুবের নামে আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সেদিনকার সেই অভিনন্দন, তিব্বতীয়দের ভক্তি-প্রণত ভাব অতীশের চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় তখন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার এই তিব্বত আগমন যে এইভাবে সার্থক হইতে চলিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। তিব্বতের গুজে নামক স্থানেই তাঁহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

এই গুজেতেই অতীশ সর্ব্বপ্রথম চা পান করেন। তিনি গুজেতে আসিয়া পৌঁছিলে পর এবং বিশ্রামাদি করিবার সময়ে গুজের অভিনন্দনকারীগণ তাঁহার নিকট তিব্বতীয় রীতিতে চা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে আমাদের দেশের এই স্বর্গীয় পানীয় পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।" অতীশ বলিলেন,—"এই পানীয়ের কি নাম? তোমরা যার এত সুখ্যাতি করিতেছ?" তিব্বতীয়েরা বলিলেন,—"মহাত্মন্! ইহার নাম চা। এই গাছের ছাল খাইতে নাই, কিন্তু ইহার

পাতা চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পান করিতে হয়। এই পানীয়ের অনেক কিছু গুণ রহিয়াছে।" অতীশ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—"এমন উত্তম পানীয় নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভক্ত শ্রমণগণের প্রার্থনার ফলে বিধাতা দান করিয়াছেন। আমি ইহা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

গুজে হইতে এই যাত্রীদল একে একে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া [ডোক্] নামক স্থানে আসিলেন। এই স্থানটী মানস-সরোবর নামক হ্রদের অল্প দূরে অবস্থিত। এই স্থানে দলে দলে গ্রামবাসিগণ আসিয়া অতীশকে বিবিধ উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। ডোক্ নামক স্থানে প্রাতর্ভোজন ইত্যাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা মানসসরোবরের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। মানস-সরোবরের নির্ম্মল নীলাভ সলিলরাশি এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া দীপঙ্কর এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি এই স্থানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তশতদল নবারুণ-দীপ্তিতে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতীশ যখন মানস-সরোবরের তীরে বাস করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নাগ-ছোও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতীশ একদিন যখন মানস-সরোবরের পবিত্র জলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছিলেন, সে সময়ে

নাগ-ছো জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি জলে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন ?" অতীশ বলিলেন,—"আমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি জানাইয়া পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। কেন তোমাদের তিব্বতীয়দের মধ্যে কি তর্পণের রীতি প্রচলিত নাই ?" নাগ-ছো কহিল—"হাঁ আমাদের দেশে মঞ্জুশ্রী দেবী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে অর্চ্চনা করিবার মন্ত্র রহিয়াছে।" অতীশ নাগ-ছোকে তর্পণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতীশ মানস-সরোবরের তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছেন, ইতিমধ্যেই এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। মানস-সরোবরের তীরবর্ত্তী তিনটি প্রদেশ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তিব্বতের ধর্ম্মবিপ্লবের ও অবনতির যুগে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের আগমন তাহাদের নিকট এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল।

এ সময়ে অতীশকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ৩০০ শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিহিত ছিল। তিন শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য শান্তিরক্ষিতকে যেমন তিব্বতীয়েরা অভ্যর্থিত করিয়া লইয়া

গিয়াছিলেন—অতীশকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পরম ভক্তি-সহকারে আজ আবার রাজার অনুচরবর্গ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে পরম প্রবীণ, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দেবতা যেমন ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া দর্শন দেন, তেমনি হে মহাপ্রাণ মহাপুরুষ, আপনি তিব্বতীয়গণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দয়া করিয়া তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি 'চিন্তামণি',—আপনি পরশমণি, যাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়, যাহার নিকট প্রার্থনা করিলে কোন কিছুই অপূর্ণ থাকে না! তেমনি জানি আপনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের এই দেশ ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন—যে ধর্ম্ম-গৌরবে ভারত গরীয়ান্, সে ধর্ম্ম গৌরব আমাদের নাই তবু আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বপ্রকৃতির অশেষ রূপ করুণা-ধারা বর্ষিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সূর্য্যের প্রখর প্রতাপ নাই, আমাদের দেশ শীতল ও শান্তিপ্রদ। আমাদের দেশে নীল-সলিলপূর্ণ হ্রদ এবং নির্ঝরিণী রহিয়াছে অসংখ্য। তিব্বতের জলবায়ু মানুষকে সজীব করিয়া তোলে। তিব্বতের পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিত বলিয়া শীতের প্রখরতা সেখানে উপলব্ধি হয় না। সেখানকার উষ্ণতা শরীর ও মনকে কর্ম্মঠ এবং উৎসাহী করিয়া থাকে।

হে প্রধান পণ্ডিত! যখন আমাদের দেশে বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, তখন খাদ্যের কোনওরূপ অপ্রাচুর্য্য থাকে না। তখন আমাদের দেশে জননী লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টিতে সমুদয় শস্যক্ষেত্র স্বর্ণ-শস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়। শরৎ ঋতুতে তিব্বতের প্রকৃতি সবুজ সৌন্দর্য্যে হাস্যময়ী হয়। মাঠে মাঠে, বনে-বনে পর্ব্বতে-পর্ব্বতে শ্যামলশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হে পরম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আমাদের দেশ প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্মভূমি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আজ আপনার শুভা-গমনে আমাদের দেশ পবিত্র হইয়াছে। আপনি আমাদের রাজার পক্ষ হইতে আমাদের মুখে সর্ব্বপ্রথম সাদর স্বাগত-বাণী শ্রবণ করুন। যদিও আমাদের বৃদ্ধ নৃপতি লা-জে-শে হোড্ পরলোক গমন করিয়াছেন, তথাপি আমাদের বর্ত্তমান নৃপতি চ্যাং-চুব অতিশয় বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য, হে মহানুভব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আপনাকে আমাদের তিব্বতে আনয়ন করিয়াছেন। আপনি যখন আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার মহৎ উপদেশে আমরা ধন্য হইব। আমাদের নৃপতি যেমন আপনার শুভাগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি আমরা সকলে আপনার আদেশ ও উপদেশ মান্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তিব্বতের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে,

আমরাও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আপনার মহিমাগীতিতে ধন্য হইব।”

এইবার অতীশ রক্ষীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া চ্যাং-চুবের রাজধানী থোলিং নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা ‘লো আ, লোমা, লোলা লোলা’ ইত্যাদি গীতরবে চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে চলিল।

অতীশের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য, মধুর হাস্যময় মুখমণ্ডল, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সঙ্গিগণকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই দেব-প্রকৃতির ভারতীয় পণ্ডিতকে দেখিয়া তিব্বতীয় অনুচরবৃন্দ পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল হইতে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বড় মধুর শুনাইত। তিনি চলিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতেন। এই যে অজ্ঞাত দুর্গম গিরিপথে চলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন তবু সকলের সঙ্গে সুমিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন,—“অতি ভালো! অতি ভালো! অতি ভালো! অতি মঙ্গল! অতি ভালো হে! মহাকরুণিকা তারা! শাক্যমুণি দেখ!” এই কয়েকটি কথা প্রতি নিয়ত তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল।

চ্যাং-চুবের প্রেরিত লোকজনের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া অতীশ বলিতেছিলেন—“এই রাজকর্ম্মচারিগণ আনন্দে

ও হাস্য-কৌতুকে গন্ধর্ব্ব-নৃপতি প্রমোদকেও হার মানাইয়াছে। ইহারা দেখিতে রক্ষ জাতীয় যক্ষ সদৃশ। সত্য সত্যই হিমাবৎ প্রদেশ অবলোকিতেশ্বর দেবের লীলানিকেতন। তাঁহারই কৃপাবলে তিব্বতীয়দের ন্যায় দুর্দ্ধষ-প্রকৃতির 'পার্ব্বত্যজাতীয় লোকেরা' মহদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই দুর্দ্দান্ত জাতীয় লোকেরা দেখিতে কদাকার ও ভীষণাকৃতি হইলেও ইহাদের প্রকৃতি দিব্য বিনয়পূর্ণ এবং ভক্তি অনুগত। ইহারা সত্য সত্যই দেব অবলোকিতেশ্বরের অনুগত সেবক। মনে হইতেছে ইহাদের যিনি নৃপতি, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হইবে।"

থোলিংয়ের পথে

এই ভাবে আনন্দ-অভিযান করিতে করিতে দীপঙ্কর যখন রাজধানী থোলিংয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন নৃপতি চ্যাং-চুবের প্রধান অমাত্য ওয়ান্ চুগ্ অতীশকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। মন্ত্রী ওয়াংচুগ্ অতীশের দুইখানি হস্ত নিজ হস্তমধ্যে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"হে প্রভু! আমরা আপনাকে রাজনির্দ্দেশ মত অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আপনি বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনি দয়া করিয়া আমাদের দেশে আগমন করিয়া

আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আপনি দারুণ পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে আমাদিগকে মুক্তি-পথের সন্ধান দেখাইতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" মন্ত্রী এই কথা বলিয়া একটি চিত্র-পট (Tapestry) উপহার দিলেন। ঐ পটে অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই পটটি প্রায় চল্লিশ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। এবং উহা অতি সুন্দরভাবে স্বর্ণ সূত্র দ্বারা কারুকার্য্যখচিত ছিল।

রাজা চ্যাং-চুবের নিকট, দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এই সংবাদ যাওয়া মাত্র ন্যাহারি নামক স্থানের লোকেরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এই ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয়গণের একমাত্র আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক গ্রামবাসী, প্রত্যেক নাগরিকের মুখেই এই মহাপণ্ডিতের কথা শুনা যাইতে লাগিল। উচ্চ, নীচ এবং সাধারণ জনগণেরও তাঁহার মুখে ম্যা-ফ্যাম্ বা মানস-সরোবরের বিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহ দেখা গেল। রাজা যে মহামানবকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য এত অর্থব্যয় করিলেন, যাঁহাকে আনিবার চেষ্টায় বহু লোকের অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে, না জানি সেই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পণ্ডিত কিরূপ দেখিতে, কিরূপ তাঁহার পাণ্ডিত্য, কিরূপ তাঁহার বাক্য ও উপদেশ। এইরূপ ব্যগ্রভাব যে জনসাধারণের

পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সে-কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা চ্যাং-চুব ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের প্রমুখাৎ দীপঙ্করের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জানিবার জন্য কৌতূহলি হইয়াছিলেন।

রাজা চ্যাং-চুব যখন ব্যগ্রভাবে দীপঙ্করের বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী লা-লোদাই দশজন অশ্বারোহী শরীররক্ষীসহ নৃপতিসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ! যে মুহূর্ত্তে বহু শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত দীপঙ্কর নেপালের পাল্‌পা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সে সময়ে নেপালের মহারাজা অতি বিপুলভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এমন কি তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত অতীশের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'দেবেন্দ্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীশের সহিত সমগ্র পশ্চিম ভারতের একজন রাজ-শ্রমণও আসিয়াছেন, তাঁহার নাম ভূমিসঙ্ঘ। ভূমিসঙ্ঘ নানা গুণে গুণান্বিত, সসাগরা ধরণীর মহারাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবার যোগ্য। ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর সমুদয় বিলাস-সুখ ও ধনৈশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তিনি জ্ঞানী মহাপুরুষ দীপঙ্করের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতীশের একান্ত অনুগত বলিয়াই আমাদের তিব্বতে আগমন করিয়াছেন। মানস-সরোবরের তীর পর্য্যন্ত প্রায় ৪২৫ জন নেপাল-রাজ-অনুচর দীপঙ্করের অনুগামী হইয়াছিলেন। সেখানে

হাজার হাজার কৃষকও রাখালেরা আসিয়া মহামতি দীপঙ্করকে বন্দনা করিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে।”

মন্ত্রীর মুখে দীপঙ্কর তাঁহার যাত্রা-পথে যে সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছেন এমন কি নেপাল-রাজও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাতে নৃপতি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। দীপঙ্কর যখন থোলিং রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন স্বয়ং নৃপতি এবং রাজদরবারের সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অতীশকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লামা দীপঙ্করকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, সম্ভবতঃ বার্দ্ধক্যের দরুনই তিনি দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই বৃদ্ধ লামার নাম ছিল, রিন্-চেন্-জং-পো। রিন্-চেন্-জং-পোর প্রতি এক সময়ে রাজা কর্ত্তৃক তিব্বতের পুরাণ এবং রং প্রদেশের উপর ধর্ম্মনেতৃত্ব ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। রিন্-চেন্-জংপো তিব্বতের ঐ সকল প্রদেশে অনেক মঠ, মূর্ত্তি ও বিদ্যা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে দশজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তাহারা “লোচবা” বা দ্বিভাষী নামে পরিচিত ছিল। রিন্-চেন্-জংপো সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত তান্ত্রিক ধর্ম্মাচার

তিব্বতে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গল্প আছে যে একবার রিন্-চেন্-জংপো একটা দুরন্ত দৈত্যকে দমন করিয়াছিলেন।

দীপঙ্করের সহিত রিন্-চেন্-জংপোর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৫ বৎসর। দীপঙ্কর তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ, এজন্য রিন্-চেন্-জংপো ভারতীয় পণ্ডিতকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যার্থনা করিলেন না, কিন্তু পরে দীপঙ্করের মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ দেবতাগণের স্তোত্র প্রভৃতি শুনিয়া তিনি একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সর্ব্বোপরি দীপঙ্করের তাঁহার প্রতি বিনয়-পূর্ণ ব্যবহার তাঁহাকে একান্ত মুগ্ধ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপোও বিনীতভাবে দীপঙ্করের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপো ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এইভাবে তিব্বত-রাজ দীপঙ্করকে পরম সমাদরের সহিত আপনার দেশে অভ্যার্থনা করিয়া লইলেন। রাজা, প্রজাদের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে ঃ "তাহাদের দীপঙ্করের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ধর্ম্মপথে পরিচালিত হইতে হইবে।" ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দীপঙ্কর যে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রাজা দীপঙ্করের বিদ্যাবত্তা ও বিবিধ গুণ দেখিয়া তাঁহাকে জো-বো-জে অর্থাৎ প্রভুস্বামী বা স্বামী ভট্টারক উপাধি প্রদান করিলেন।

দীপঙ্কর থোলিং উপনীত হইয়া তিব্বতে মহাযান মত প্রচার করিলেন। এবং তাঁহার প্রস্তাবিত মত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ তিব্বতের ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সংস্কার করিতে সমর্থ হইলেন। অতীশের চেষ্টা ও যত্নে তিব্বতের লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের গরিমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

দীপঙ্করের উপদেশানুসারে চলিয়া তিব্বতীয় লামারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতীশ প্রায় বারো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্য্যটন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পবিত্রতা এবং প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জনগণ মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ, ধর্ম্ম-জীবন, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি এবং অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেখিয়া তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর কিভাবে তিব্বতবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত।

লাশার নিকটবর্ত্তী ন্যাথাং নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রীঃ অঃ ৭২ বা ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গ্রামটি নেতাং নামে পরিচিত। কেহ কেহ এই স্থানের নাম নের্তাম্ বলেন। চীনারা

বলে ই-তাং। এসিয়ার সর্ব্বত্র, তিব্বতের প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহে যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে সেই সেই স্থানে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সকলের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম ধর্ম্মনেতা ব্রোমতোনের ছিলেন তিনি ধর্ম্মাচার্য্য।

দীপঙ্কর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং তিনি একশতটি মহাযান ধর্ম্ম-সম্পর্কিত উপদেশ দিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার লিখিত কতিপয় পুস্তকের নাম দিলাম (১) বোধিপথপ্রদীপ, (২) চর্য্যা-সংগ্রহ-প্রদীপ, (৩) মধ্যমোপদেশ, (৪) সংগ্রহগর্ভ, (৫) মহাযান পথসাধন-বর্ণ সংগ্রহ, (৬) মহাযান-পথ-সাধন-সংগ্রহ, (৭) দশকুশল-কর্ম্মোপদেশ, (৮) গুরুকর্ম্মবিভঙ্গ, (৯) সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ, (১০) সপ্তকবিধি, (১১) গুরুক্রিয়াক্রম, (১২) সরঙ্গতায়দশ। দীপঙ্কর নয়পালকে উপদেশপূর্ণ যে পত্র লেখেন, তাহা 'বিমলরত্ন-লেখা' নামে পরিচিত। তিব্বতে দীপঙ্কর ক-দং নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতীশের সমাধি-মন্দির গ্রো-ম নামে পরিচিত। নাম নামক গ্রামের যে স্থানে অতীশের সমাধি-মন্দিরটি অবস্থিত, সে স্থানটি অতি নির্জ্জন। যে দীপঙ্কর তিব্বতীয়দের ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাহারা কিন্তু অতীশের সমাধি-মন্দিরটি

রক্ষার দিকে একান্ত উদাসীন। ওয়াডেল সাহেব অতীশের সমাধি-মন্দিরটি দেখিয়া লিখিয়াছেনঃ—"আমি নাম গ্রামে দীপঙ্করের সমাধি-মন্দিরটির ধ্বংসপ্রায় অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। যে ধর্ম্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা তিব্বতের ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য সুদূর তিব্বতের নির্জ্জন প্রান্তরে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন, দুঃখের কথা তিব্বতীয়েরা কিনা তাঁহার সমাধি-ভবনটিকে রক্ষা করিবার প্রতি একান্ত উদাসীন। যে গৃহের মধ্যে অতীশের দেহাবশেষ রক্ষিত, তাহা একটা গোলা-ঘরের ন্যায় কক্ষ মাত্র। বাহিরের দিক্‌টা পীতবর্ণানুরঞ্জিত, উহার চারিদিকে কতকগুলি প্রাচীন উইলো তরু মাথা তুলিয়া একটি বীথি রচনা করিয়াছে। মন্দিরটির আকার অনেকটা চুরতেনের মত। উহার উচ্চতা ১৪ ফিট, পরিধিও তদনুরূপ। ইহার উপরটা বালিচুণের কাজ করা এবং মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র অপটু চিত্রকরের অঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধ এবং অতীশের নিজেরও কয়েকটি চিত্র দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। দীপঙ্করের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। নিম্নভাগে শ্বেত হস্তী, শ্বেত ছত্র প্রভৃতি পবিত্র সপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে। ছয় জন অশিক্ষিত লামার উপর এই সমাধি-মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রহিয়াছে। ইহারা সমাধি-মন্দিরের ২০০ শত গজ দূরে একটি তরুলতা-গুল্মহীন প্রস্তরাকীর্ণ পর্ব্বতের নিম্নভাগে বাস করে। এই ছয়জন লামার মধ্যে মাত্র

একজন সামান্য-ভাবে কিছু লিখিতে পড়িতে জানে। এখানকার পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তি ও নিকটবর্ত্তী স্থানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য রীতি দেখিয়া মনে হয় যে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই স্থানের কাছাকাছি কোথাও হয়ত বা বাস করিতেন।”

দীপঙ্কর ন্যা-থ্যাং নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ন্যা-থাং লাশা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ন্যা-থাংয়ের বিহারটি বর্ত্তমান সময়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখানে এখনও প্রায় পঞ্চাশ জন লামা বাস করেন। আজ পর্য্যন্ত বংশপরম্পরাগতভাবে তিব্বতীয় গল্পপ্রিয় বৃদ্ধগণ ও লামাগণ ভারতীয় মহাপুরুষ দীপঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গিগণের মহানুভবতার কথা বলিয়া থাকেন।

কুমারজীব

তিব্বতের রাজধানী লাশা নগরীতে এক সময় কেহই প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করিতে পারিত না বলিয়া লোকে উহার নাম দিয়াছিল নিষিদ্ধ নগরী বা "Forbidden City"। পণ্ডিতেরা তিব্বতের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, সে অতি প্রাচীনকালে তু-বুট্ নামে একটা জাতি ছিল বরফে ঢাকা বন্ধুর এই পার্ব্বত্য দেশের অধিবাসী। বেট, ভূত, বোড এ সব শব্দ দ্বারা তিব্বতের সেই প্রাচীন অধিবাসীদের নানা গোষ্ঠিকে বুঝাইত। এইভাবে তু-বুট্ হইতে দেশটির নাম হইল তিব্বত। ঐ সব জাতীয় লোকেরা যে মোঙ্গোলীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিব্বতের এইসব অধিবাসীদের মধ্যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ শ্রমণেরা আসিয়া মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার করেন। এখনও মধ্য এসিয়া, চীন প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির শত শত নিদর্শন দেখিতে পাইবে।

সেকালে যে সব শ্রমণেরা হিমালয় পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, সাহসী ও নির্ভীক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেড় হাজার বৎসরেরও আগে, অনুমান ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে, চীনদেশে হিয়ান্-ইউ নামে এক সম্রাট ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একজন পরম উৎসাহী পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাদের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ লোকই শাক্য মুনির মহদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ এবং চীন-সম্রাট এই ধর্ম্মকে রাজধর্ম্মরূপে গ্রহণ করায় চীনারা বুদ্ধদেবের দেশ এই ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে সময়ের চৈনিক পর্য্যটকেরা মধ্য এসিয়ার পথে পারস্যদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতেন। সম্রাট হিয়ান-ইউর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন হইতে পারস্য পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল।

৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট তিব্বতে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি এই আদেশ দেন যে "তুমি সেখানে যদি কোন ভারতীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেখিতে পাও তাঁহাকে সঙ্গে আনিবে—কিংবা পাঠাইয়া দিবে।" সে সময়ে কুমারজীব নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত উত্তর তিব্বতের অন্তর্গত খুৎশী নামক স্থানে থাকিতেন, তাঁহার সহিত শ্রমণ বিমলাক্ষ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, বিমলাক্ষের চোখ দুইটি ছিল নীল পদ্মের মত নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। তাই সেই শ্রমণের নাম হইয়াছিল বিমলাক্ষ।

কুমারজীব ও বিমলাক্ষ চীন সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে রওয়ানা হইলেন। পথে যে তাঁহাদের কত ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইল, সে দুর্গম পথের কল্পনা করাও সহজ নহে। অজানা পথ, জল মিলে না, খাদ্য মিলে না, সঙ্গী নাই, রৌদ্রতপ্ত বালুকার সাগরের যেন সীমা নাই; সেই পথে কুমারজীব চলিয়াছিলেন সঙ্গী বিমলাক্ষকে লইয়া চীনের রাজধানী নান্‌কিনে।

বিমলাক্ষ এই পথের ক্লেশ সহ্য করিয়া চীনে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

কুমারজীবকে সম্রাট অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সুখ-সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন।

সম্রাটের আদেশে কুমারজীব ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থাদির চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। অনেকের কাছেই হয়ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে কিন্তু অতি সত্য কথা ৮০০ জনেরও বেশী ভারতীয় পণ্ডিত এই অনুবাদ কার্য্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারজীবকে সাহায্য করিতেন। সম্রাট নিজে বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ঐ সমুদয় অনুবাদ পড়িতেন ও আলোচনা করিতেন। কুমারজীব সংস্কৃত ও চীন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অনুবাদের কার্য্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রায় ৩০০ শতখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই

সব বইয়ের টীকাটিপ্পনী এমন সুন্দরভাবে করিয়াছিলেন যে সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকও বুঝিতে পারিয়াছে।

চীনদেশের ইউ-ইয়াং নামক দেশের অধিবাসী বিখ্যাত পর্য্যটক ফাহিয়ান কুমারজীবের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ভারতবর্ষে আগমন করেন—বিনয়পিটক সম্বন্ধে গবেষণা করিতে এবং উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিবার জন্য।

কেহ কেহ বলেন—"খাসগড় ও তুরকানের মধ্যভাগে কাচ-নগর অবস্থিত। এখানে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ভিক্ষু কুমারজীব লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে চীন ভাষায় কতকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ক্রমে কাচ মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়াছিল। চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং-এর মতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নত ছিল এবং অনেক বিহার ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি ছিল।"*

ফাহিয়ানের কথা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে। এই চীন পর্য্যটক তাতার, আফগানিস্থান এমন কি ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। আফগানিস্থান হইতে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথে অগ্রসর

* বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা; ভারতবর্ষ। মাঘ, ১৩৪৭, ২১৭পৃষ্ঠা।

হইয়া সিন্ধুনদের পারে নানাদেশ ও পল্লী অতিক্রম করিয়া উজ্জয়িনী আসেন। সেখান হইতে মগধ আসিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এবং বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ফাহিয়ান সিংহলে আসেন। সিংহল হইতে ক্যানটন্ গমন করিবার সময় সমুদ্রের মধ্যে তিনি ভীষণ ঝড়ে পড়িয়াছিলেন। জাহাজের যাত্রীরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জাহাজের ব্রাহ্মণ-যাত্রীরা ফাহিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রীদিগকে বলিয়াছিল যে, এই চীনা শ্রমণ জাহাজে উঠার জন্যই এমন ঝড় উঠিয়াছে, অতএব আসুন আমরা এই শ্রমণকে একটি দ্বীপে নামাইয়া দেই,—একজন লোকের জন্য কি আমরা সকলে প্রাণ হারাইব ?

জাহাজে ফাহিয়ানের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিলেন— "যদি তোমরা ফাহিয়ানকে নামাইয়া দাও তবে আমাকেও নামাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবে যদি কোন রকমে চীন দেশে পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে সে দেশের রাজার কাছে তোমাদের এই হীন ব্যবহারের কথা বলিব। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী। অতএব আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ভাল ভাবে বিচার করিয়া কাজ করিও।" জাহাজের যাত্রীরা এই কথা বলিবার পর ফাহিয়ানের প্রতি আর ব্রাহ্মণ-যাত্রীরা কোনরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে সাহসী হয় নাই।

ফাহিয়ান যখন চীনদেশ হইতে রওয়ানা হন, তখন তাঁহার সঙ্গীরা ছিলেন সংখ্যায় অনেক, কিন্তু পথ-ক্লেশ ও ব্যারামে ভুগিয়া অনেকেই মারা যান।

ফাহিয়ান কুমারজীবের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন ও দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিত কুমারজীবের প্রতি তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

সেই কোন্ সুদূর অতীতে ভারতীয় পণ্ডিত কুমারজীব হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম পথে অভিযান করিয়া তিব্বত, তুরকান প্রভৃতি স্থানে গমন পূর্ব্বক দেশে দেশে ভারতের জ্ঞান-গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও হৃদয় অতুলনীয় গৌরবে পুলকিত হইয়া উঠে।

পণ্ডিত কিষণ সিংহ

তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়া-অভিযান

[অনেকে মনে করেন আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরা কেহই কোনরূপ দুঃসাহসিক অভিযান করেন নাই। ইহা আমাদের অজ্ঞতার কারণ মাত্র। পণ্ডিত কিষণ সিংহ ভারতের একজন সাহসী অভিযানকারী। তিনি জরীপ বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৭৯-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়া অভিযান করেন। পণ্ডিত নয়ান সিংহ, কিষণ সিংহের পূর্ব্বে ১৮৭৩-১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাগ্রে হিমালয়-অভিযান করেন। এবং মধ্য তিব্বতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা ভারতীয় জরীপ বিভাগ হইতে প্রকাশিত কিষণ সিংহের অভিযান বিবরণ হইতে এই হিমালয়-অভিযান প্রকাশ করিলাম।]

তিব্বতের পথে

আমি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখ, তিব্বত গমন করিব বলিয়া দার্জ্জিলিং ছাড়িলাম। সঙ্গে চলিল আমার ভৃত্য চাম্বেল আর একজন লোক, তার নাম গঙ্গারাম। গঙ্গারামকে সরকার বাহাদুর এই অভিযানে আমার সঙ্গী হইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার একটু আগে তিস্তা নদীর পারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তিস্তা নদীর দুই তীরের প্রাকৃতিক শোভা যে কিরূপ সুন্দর তাহা সকলেই জানেন। পরদিন আমরা কালিম্পোং

আসিলাম। এখানে একটী ছোট বাজার বসে। মাত্র ১৫।২০টী দোকান ঘর। প্রতি রবিবার হাট মিলে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র সংগ্রহের নিমিত্ত এখানে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা চলিয়াছি অজানা দুর্গম দেশের দিকে। কাজেই পথে খাদ্যদ্রব্যাদি মিলিবে কিনা সে-বিষয়ে কিছুই জানিতাম না; এজন্য এখান হইতেই কিছু কিছু আবশ্যক মত খাদ্যদ্রব্য বা রসদ সংগ্রহ করিয়া লইলাম। ২৯শে এপ্রিল কালিম্পোং ছাড়িলাম। পথে পড়িল পিডাং নামে একটি ছোট গ্রাম। এখান হইতে আরও ছোটবড় দুই একটী গ্রাম ছাড়াইয়া ১লা মে তারিখে চুমাকেন্ নামে একটী গ্রামে আসিলাম। এখানে আসিয়া ভয়ানক বৃষ্টি পাইলাম। বৃষ্টির জন্য সে-দিন আর রওনা হইতে পারিলাম না; পরের দিন রওনা হইয়া তিনটী ছোট বড় গ্রামে বিশ্রাম করিয়া ৬ই মে তারিখে জিলেপ নামে উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম নাথাং নামক একটী গ্রামে।

এই গ্রামটী উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। তখন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল—তিনদিন যাবত বরফ পড়া আর থামিল না। এই জন্য এই তিন দিন আমাদের নাথাং থাকিতে হইল। ১০ই মে তারিখ আমরা আসিলাম ইউক্। এ

জায়গাটিতে প্রচুর ঘাস দেখিতে পাইলাম। এখানে তিব্বতের সীমা আরম্ভ হইল। অনেক গ্রামের লোকেরা তাহাদের চমরী গোরুর পাল লইয়া এখানে আসে। অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহারা উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে যে বিস্তৃত সমতল ভূমি রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের পশু চারণ করিয়া থাকে। ১২ই মে আমরা বোদ্‌না নামে একটী গিরিপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। সারাপথ বরফে ঢাকিয়া গিয়াছিল কোন কোন জায়গায় বরফ ছিল প্রায় তিন ফিট গভীর। আমরা লান্‌ট নামক গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। এখানে একজাতীয় চীর গাছ হয় তাহা হইতে বেশ উৎকৃষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়—ঘাসও জন্মে প্রচুর পরিমাণে।

১৩ই মে। আমরা রিন্‌চেন্‌গ্যাং নামক একটা পার্ব্বত্য গ্রামে আসিলাম। গ্রামটী বেশ বড়—প্রায় ত্রিশখানি বাড়ী আছে। এখানে একটি গোম্-পা বা গুম্ফা দেখিলাম। গোম্‌পাটি গ্রাম হইতে প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চে হইবে। এই গোম্‌পার বা মঠের ভিতরে দশ বারোটি প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহাতে কয়েকজন লামা বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা শুধু ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া এবং মন্ত্র আওড়াইয়াই সময় কাটান। এই গ্রামটির নীচ দিয়া আমো নামক পার্ব্বত্য নদী বহিয়া যাইতেছে। ভূটানের দিক হইতে এই পার্ব্বত্য নদীটি বহিয়া আসিয়াছে। এখানে লোকের তেমন বাস

নাই, কেননা যায়গাটি অনুর্ব্বর। এই গ্রামে সামান্য রকমের কিছু কিছু আলুর চাষ হয়। আমরা দুই দিন মাত্র এইখানে ছিলাম।

১৬ই মে। আমরা ওখান হইতে আমো নদীর পারের পথ ধরিয়া চুম্‌বি আসিলাম। সিকিম এবং দৈন্‌জুঙ্গ নামক স্থানের রাজা গ্রীষ্মকালে এখানে বাস করেন। একটা চারিকোণ চত্বরে কয়েকটি তেতালা পাকাবাড়ী। তাহার চারিদিকে লাল পাথরের প্রাচীর। দুইটি বড় বড় দরজা আছে। একটি উত্তর দিকে অন্যটি দক্ষিণ দিকে। চুম্‌বিতে নদীর উপর একটি কাঠের পুল আছে। পুলটি ৪০ ফিট লম্বা হইবে। চুম্‌বি হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম-কোণে দুইটি নদীর সঙ্গমস্থল। একটি আসিয়াছে উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া অপরটী আসিয়াছে উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে। এই দুই নদীর মিলিত সলিলধারাই আমো নদী নামে পরিচিত। আমরা নদী দুইটির সঙ্গমস্থলের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুন্দর দৃশ্য। দুই দিকে বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী, শ্যামল চীর গাছের সারি। আর সেই পাহাড়ের দেওয়াল-ঘেরা পথের মধ্য দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে—কি তার প্রবল উচ্ছ্বাস।

এই নদীর পথে চলিতে চলিতে একটি গ্রাম পাইলাম। গ্রামটির নাম গ্যালিঙ্গখা—ছোট গ্রাম, মাত্র চল্লিশখানি বাড়ী। নদীর ডাহিন দিকে রূপাখা নামক গ্রামে একটি গোম্‌পা

আছে। সেই গোম্পার নাম—দোংক্যার। ১৮ই মে—আজ আমরা ফারি আসিলাম।

ফারিতে একটী ছোট দুর্গ আছে। পাহাড়টী অন্যান্য পাহাড় হইতে বিচ্ছিন্ন। একটী মাত্র শৃঙ্গ। শৃঙ্গের উচ্চতা ১২০০ ফিটের বেশী হইবে না। দুর্গের নীচে—প্রায় ২০০ ফিট নীচেই বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর। দুর্গের নীচ হইতে উহা চারি মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এ যায়গায় জ্বালানিকাঠ পাওয়া যায় না। একমাত্র গোময়ই জ্বালানিকাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। এখাকার সমতল ভূমি হইতে এবং পাহাড়ের উপর হইতে তিব্বতীয়দের জেমো-লা-রি নামক পবিত্র গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। জেমো-লারি; চুমুলহারি নামে পরিচিত। ঐখানে ত্রিকোণমিতি জরিপ বিভাগের একটি অফিস আছে। এখান হইতে বারো মাইল দূরে চুচান্ নামে উৎস বা প্রস্রবণ অবস্থিত। এই প্রস্রবণের জলের রোগ নিবারণ করিবার শক্তি অসাধারণ বলিয়া খ্যাতি আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা চিকিৎসকের ধার বড় একটা ধারে না। তাহারা কাহার কোনও পীড়া হইলে এখানকার এই প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া এবং জল পান করিয়াই রোগমুক্ত হয় বলিয়াই বিশ্বাস করে। অতি বড় দুরারোগ্য ব্যাধিও নাকি এই জলে সপ্তাহকাল মাত্র স্নান করিলেই নিরাময় হয়।

এখানে দুইজন জংপো থাকেন। জংপো মানে দুর্গরক্ষক। ইঁহারা লাশা হইতে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের কাজ, কর আদায় করা। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্যের অনুপাতে শতকরা দশ ভাগের এক ভাগ কর আদায় করিবার রীতি আছে। জংপোরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ বিচার করেন। গঙ্গারামের কঠিন পীড়া হওয়ায় আমাদের এখানে প্রায় তিন মাস কাল থাকিতে হইয়াছিল।

১৬ই আগষ্ট—আজ ফারি ছাড়িয়া ছুটিয়া নামক স্থানে আসিলাম। এখান হইতে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া ১৭ই তারিখে তুনা গ্রামে আসিলাম। গ্রামটি ছোট, মাত্র দশ ঘর লোক এখানে বাস করে। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরের দিন ১৮ই আগষ্ট কা-লা-সার গ্রামে আসিলাম। বেশ বড় গ্রাম। ষাটখানা বাড়ী। সারা পথে চাষবাসের কোনও চিহ্ন দেখি নাই, এখানে কিন্তু চাষবাস দেখা গেল। তুন গ্রামের ১৮ মাইল রাস্তার ঠিক ডান দিকে রাম বা বাম নামে একটি হ্রদ আছে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে এই হ্রদের জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। নভেম্বর মাসে বরফ এমন কঠিন হয় যে জলের কোন গতিই আর থাকে না। ফেব্রুয়ারী মাসে কতক কতক অংশের বরফ গলিয়া যায়। কালাসহরের কাছাকাছি পশ্চিমদিকে আর একটি সুন্দর হ্রদ আছে, হ্রদটির

নাম কালা। কালাসার গ্রামের লোকেরা এই হ্রদে আসিয়া মাছ ধরে। হ্রদটি তেমন গভীর নয়, কাজেই জাল দিয়া সহজেই মাছ ধরা যায়। ইহারা একরকমের জাল ব্যবহার করে, তাহা চারজনে টানিয়া তুলিতে হয়। এই জালে প্রচুর মাছ আসে। মাছ ধরিয়া ইহারা সূর্য্যের কিরণে শুকাইয়া লয়, তারপর বাজারে বিক্রয় করে। এই শুক্‌নো মাছ খুব বেশী পরিমাণে বিক্রয় হয়।

আমরা ১৯শে আগষ্ট স্যামাডা নামক একটি ছোট গ্রামে আসিলাম। ড্যাগ্‌কারপো নামক গ্রাম হইতে স্যামাডা পর্য্যন্ত পথটুকু বড় সুন্দর। বিস্তৃত সমতল মাঠ, কোথাও চড়াই বা উৎরাই নাই। ২০শে আগষ্ট—আজ রাঙ্গিগো আসিলাম। পথে একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখিয়াছিলাম।

২১শে আগষ্ট গিয়াংৎসি আসিলাম। ছোট সহর। নিয়ং নদীর দক্ষিণ তীরে সহরটি অবস্থিত। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি দুইটি পাহাড়ের উপর গিয়াংৎসি সহরটি শোভা পাইতেছে। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতটির সহিত উত্তর দিকের একটি পর্ব্বতশ্রেণী সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতটি নীচের সমতল ভূমি হইতে ৩০০ ফিট উঁচু হইবে। এই পাহাড়টির উপর ফারির ন্যায় একটি বড় দুর্গ আর পশ্চিম দিকের পাহাড়টির উপর একটি গোম্‌পা আছে। সেই গোম্‌পাতে ৫০০ পাঁচ শত লামা বাস

করেন। এই গোম্‌পাতে একটি চুরতান্‌ আছে। তিব্বতিয়েরা চুরতানকে বলে প্যানগোন্‌ চুরতান্‌। তাহাঁদের কাছে ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চুরতান বলিতে কি বুঝায় তাহা বলিতেছি,—চুরতান্‌ বা চিয়োরতিন—এক রকমের রঙিন অট্টালিকা। কোনটি বড় হয় কোনটি বা ছোট হয়। মাঝখানকার বাড়ীটির উপরে স্বুবর্ণগোলক বা অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায়। এই মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ, মূর্ত্তি এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজোপকরণ সজ্জিত থাকে।

গিয়াংৎসি একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে নাম্বা নামে একপ্রকার পশমি কাপড় তৈরি হয়। এখানকার বাজার বেশ বড়। নেপালি ও চীনা-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। আমাদের পণ্যদ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য এখানে প্রায় এক সপ্তাহ কাল ছিলাম। স্যামাডা হইতে গিয়াংৎসি পর্য্যন্ত পথটুকু আদবেই ভাল নয়। বন্ধুর এবং প্রস্তরাকীর্ণ।

২৮শে আগষ্ট— আজ উপ্‌সি গ্রামে আসিলাম। এখানে চীনাদের একটি বড় রকমের গিয়াংখাং বা চৈনিক আবাস রহিয়াছে। গিয়াংৎসি হইতে এখানে আসিতে আমাদের কোনও ক্লেশ হয় নাই, কেননা পথটি বেশ ভাল ছিল। একেবারে সমতল, কাজেই পথ চলিতে কোনও ক্লেশ হয় নাই।

৩১শে অগষ্ট—আমরা ন্যাংকরৎসি নামক গ্রামে আসিলাম। ইহার কাছেই বিখ্যাত পাল্‌তি হ্রদ। আমি এ পর্য্যন্ত পথে কোথাও আর এত বড় হ্রদ দেখি নাই। এই হ্রদটির আকার কতকটা অশ্বখুরের মত। একটি ছোট পর্ব্বতকে ঘিরিয়া এই হ্রদটি শোভা পাইতেছে। পাহাড়ের উপর একটি দেব-মন্দির। মন্দিরটির নাম—দোরজি-ফ্যামো। শুনিলাম পাহাড়ের উপরে বসতি আছে। হ্রদের মধ্যে অনেক মাছ। এই হ্রদের মাছের লাশা সহরে খুব আদর। জমাট বরফের ছিদ্রপথে বর্শি দিয়া এই হ্রদের মাছ ধরিতে হয়।

১লা সেপ্টেম্বর—আজ রওয়ানা হইয়া আমরা দুই একটি গ্রামে বিশ্রাম করিয়া কাম্‌পাপরৎসি আসিলাম। পথে কায়রা নামে গিরিপথ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ৩রা সেপ্টেম্বর—আমরা স্যাম্পো বা ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে আসিলাম। আমরা চ্যাকসাম গ্রামের কাছাকাছি স্যাম্পো পার হইলাম। প্রস্তরাকীর্ণ দুর্গম পথ। নদীর পার অতি ভয়ঙ্কর। পুলটি অদ্ভুত রকমের। দুই দিকে দুইটি শক্ত ঝুলানো দড়ির সঙ্গে তক্তা বাঁধা। তক্তা-গুলি ৩×১ ফুট লম্বা ও চওড়া হইবে। এগুলি লম্বালম্বিভাবে ঝুলানো দড়ির সঙ্গে বাঁধা বলিয়া একসঙ্গে একজনের বেশী লোক চলিতে পারে না। লোহার শিকল দুই দিকেই স্তূপীকৃত শিলা রাশির মধ্যে খুব শক্ত করিয়া প্রোথিত কাষ্ঠদণ্ডের সহিত বাঁধা

বলিয়া স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পুলটির দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১০০ পা। এইভাবে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর—নেতাং আসিলাম। নেতাং কিচু নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত। নদীটি প্রায় একশো পা চওড়া হইবে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ লাশা বা নিষিদ্ধ নগরীতে পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের সঙ্গে যা কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল সব বেচিয়া ফেলিলাম এবং মোঙ্গোলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। জীবনে যে লাশা নগরী দেখিব বলিয়া কোন দিন ভাবি নাই, আজ তাহাই দেখিলাম।

লাশার কথা—মোঙ্গোলিয়া যাত্রা

লাশাতে বেশ আরামে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মোঙ্গোলিয়ায় যাইবার সঙ্গী যাত্রীদলের অপেক্ষায় এখানে ছিলাম। একদিন শুনিলাম যে শীঘ্রই একটি দল মোঙ্গোলিয়ায় যাইবেন। আমি যেমন শুনিলাম, অমনি গার্পোনের বা সর্দ্দারের নিকট যাইয়া কবে কখন ঐ যাত্রীদল রওনা হইবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু গার্পোন কোন খাঁটি সংবাদ দিলেন না। তিনি বলিলেন—সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ইহারা রওনা হইবে। আমি গার্পোনকে বলিলাম আমাকে দিন ও সময়টা ঠিক্ করিয়া বলিলে ভাল হয়।

কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—"জানেন, কোন দিন তারিখ ঠিক করে বলা যেতে পারে না। পথে পদে পদে বিপদ, দস্যু-ডাকাতের ভয় অত্যন্ত বেশি। তারা সকল সময়ই খোঁজ করে কখন কোন্ যাত্রীদল লাশা ছেড়ে রওনা হয়েছে। ডাকাত-দলের ঐসব গুপ্তচরেরা দলের সর্দ্দারকে খবর দেয় এজন্য অনেক দলই নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া অবস্থাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিলাম।—অবশেষে নভেম্বর মাসে সর্দ্দার অন্য একদল বণিককে এবং আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার কাছে গেলে বলিলেন—আমার সঙ্গে যে সর্দ্দারের পরিচয় আছে তিনি শীঘ্রই মোঙ্গোলিয়া যাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার লাশাতে ৫০০ তামিমাস কুশ বা কুর ১৫৬ ভারতীয় মুদ্রা ঋণ আছে। যদি আমরা তাহার সেই ঋণের টাকাটা লাশা ছাড়িবার পূর্ব্বে পরিশোধ করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে তিনি আমাদের সঙ্গী হইতে পারেন। একথা শুনিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম কিন্তু আর কোন উপায়ও ছিল না। একজন পাকা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গীরূপে না পাইলে এইরূপ দুর্গম পথের অভিযানে অগ্রসর হওয়াও সঙ্গত নয়। আমরা অগত্যা তাঁহার ঋণের টাকা শোধ করিয়া দিলাম। এইবার সর্দ্দার বলিলেন—আর তিন চার মাস পরে সে রওনা হইতে পারিবে, আমার অন্য

কোন উপায় ছিল না, কাজেই লাশাতে তাহার যাত্রার দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

আগষ্ট মাসে মোঙ্গোলিয়া হইতে একজন সওদাগর আসিলেন তাঁহার অর্দ্ধেক সঙ্গীদল শীঘ্রই মোঙ্গোলিয়ায় ফিরিয়া যাইবে। আমি তাঁহার কাছে আমার অভিপ্রায় বলা মাত্রই তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর লাশা আসিয়াছিলাম আর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর লাশা ছাড়িয়া মোঙ্গোলিয়ার দিকে রওনা হইলাম।

আমি যে এক বৎসর লাশায় ছিলাম সে সময়ে আমি মোঙ্গোলীয়দের ভাষা শিখিতেছিলাম। জুন, জুলাই মাসে বায়ুমান যন্ত্রের দ্বারা তিব্বতের বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

এইবার লাশার কথা বলিব। লাশা সহরটির বেড় প্রায় ছয় মাইল হইবে। সহরের চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তার মাঝখানে একটী প্রায় সমতল ভূমির মধ্যে লাশা সহরটী অবস্থিত। যে নদীর দক্ষিণ তীরে সহরটী অবস্থিত তাহার নাম 'কিচু'। সহরের মাঝখানে একটী উচ্চস্থানে ঝিয়ো নামে বিরাট মন্দির বিরাজিত। মন্দিরটী চতুষ্কোণ। মন্দিরের ছাদটী সোনার পাতে মোড়া। উহার ভিতর অনেক মূর্ত্তি আছে তবে দুইটি মূর্ত্তি প্রধান—একটীর নাম

শাক্যমুনি এবং আরেকটীর নাম পালদেন্‌লামো বা ভারতের কালীমাতা। গল্প আছে শাক্যমুনি ভারতবর্ষ হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মূর্ত্তি দুইটীরই গায়ে নানা অলঙ্কার। সোনা ও মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা অলঙ্কার সব তৈরি। এই মন্দিরের কাছে বিচারালয়, থানা এবং ধনাগার। মন্দির এবং এই সব অফিস আদালতের চারিদিক বেড়িয়া একটী প্রশস্ত রাজপথ—চওড়া প্রায় ৩০ ফিট! এই রাস্তার দুই ধারে তিব্বতের চীনের, নেপালের, কাশ্মীরের এবং আজীমাবাদের (পাটনার) সওদাগরদের নানা দোকান-পাট। এখানে ভানাগ-শীয়, তুম্‌শীকাং এবং রামোচী নামক এই তিনটী রাস্তায় বিদেশী সওদাগরেরা আসিয়া বাস করেন। ওয়াংদুশিগা নামে একটী প্রকাণ্ড চত্বরে বা চকের মত স্থানে প্রতিদিন সকালে বাজার মিলে। বাজারে সকল প্রকার জিনিষ-পত্রই পাওয়া যায়।

সহরের পশ্চিম দিকে একটী পাহাড়ের উপর লাশার মেডিক্যাল স্কুল অবস্থিত। উহার নাম চিয়াক্‌পোরি। এখানে ৩০০ দাবা বা ছাত্রকে পড়িতে দেখিলাম। এখানে পড়ার সময়ের কোন ঠিক নাই কিন্তু তাহাদের পড়াশুনা শেষ হইলেই চাকরী পায়। এই চাকরী প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে কিংবা নিজেদের চেষ্টা যত্নে ছাত্রেরা যোগাড় করিয়া নেয়। এই বিদ্যালয়ে নানারকম ঔষধপত্র রাজা রাজকর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্য

প্রস্তুত থাকে। স্কুলের উত্তর দিকে পাহাড়ের নীচে রাজার বাড়ী। রাজাকে তিব্বতীয়েরা বলে গিয়ালবো। রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ দুর্গ অবস্থিত। একটী স্বতন্ত্র ও উন্নত পর্ব্বত-শিখরের উপর পোটালা বা চাই নামে একটী প্রাসাদ আছে। ঘুরাণো সিঁড়ি বাহিয়া উহার উপরে উঠিতে হয়। এইখানে তীব্বতীয়দের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু লামা বা কিয়ামকুংরিংবোচি লামাই হইতেছেন তিব্বতের সর্ব্বে-সর্ব্বা। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি অমর, কেবল তাঁহার আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ অবলম্বন করে মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু অর্থে কায়া পরিবর্ত্তন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার মৃতদেহ একটা কফিনের ভিতর পুরিয়া কয়েকদিন রাখিয়া তবে সমাধি দেওয়া হয় এবং তাহার উপরে ধাতু-নির্ম্মিত একটা ফাঁপা স্তম্ভ দাঁড় করাইয়া রাখে। ঐ স্তম্ভটী সোনার পাতে মোড়া থাকে। এইরূপ স্তম্ভের নাম কুতাং, দেখিতে যেন একটী ছোটখাট চুরতান্।

একজন লামার মৃত্যুর ঠিক্ এক বৎসর পরেই নূতন লামার আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাব, নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীতে পূর্ণ। যখন কোন পরিবারে বিশেষ লক্ষণযুক্ত নবীন শিশু লামার আবির্ভাব হয়, তখন সে সংবাদ শিশুর পিতামাতা নিকটবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারীকে জানাইলে খুব জোর অনুসন্ধান চলে। কর্ম্মচারীদের অনুসন্ধানে যখন সত্য সত্যই শিশুটিকে লামার

গুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় তখন তাহারা সেই সংবাদ গিয়ালবো বা রাজাকে দেন। গিয়ালবো হইতেছেন লাশার বা তিব্বতের শাসন-সংরক্ষণের কর্ত্তা। তৎক্ষণাৎ মৃত লামার দাস-দাসী ও কর্ম্মচারীরা সেই বাড়ী ছুটিয়া আসেন, নানারূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। তাহাদের পরীক্ষার পর যদি শিশুটি সত্য সত্যই শুভ লক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীরা শিশুর জন্মস্থানে গমন করিয়া তাহাকে ও তাহার পিতামাতাকে সহরের কাছাকাছি একটি গোম্‌পাতে স্থানান্তরিত করেন। তারপর এক শুভদিনে বিশেষ ধুমধামের সহিত পোটালা দুর্গে আনা হয়। এই শিশু লামা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপর রাজ্যের ধর্ম্মসংক্রান্ত ও বিবিধ বিচার ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়। যদি একটির অধিক সব-লক্ষণ প্রাপ্ত শিশুর কথা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে তখনই হয় মুস্কিল। স্মূর্ত্তি খেলিয়া ঠিক্ করিতে হয়।

লাশা সহরের উত্তরে একটি অতি বৃহৎ চুরতান্ আছে। এই চুরতান্‌টির নাম গিয়াংবুংমোচি। গিয়াংবুংমোচি তিব্বতীয় বীর ছিলেন। তিনি একা (১০০,০০০ একলক্ষ) শত্রু নিধন করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শত্রু হইতেছে চীনারা। তাঁহার বীরত্বের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য দেশবাসী এই চুরতানটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই চুরতানের কাছে রাসোচি-ঝিয়ো নামে একটি দেবস্থান আছে।

বৎসরের প্রথম দিন ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তিব্বতীয়-দের নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। তখন খুব উৎসব হইতে থাকে। সে সময়ে তিব্বতীয়েরা বিশ্বাস করেন যে সমুদয় দেবদেবীরা লাশাতে আসেন। তখন মস্ত বড় মেলা বসে। নানাস্থান হইতে লোক আসে। কেহ আসে দেবদর্শনে, কেহ বা আসে শুধু দর্শকরূপে তামাসা দেখিতে। সব দাবা এবং তাহাদের দলপতি লামারা লাশা আসেন। সকলে মিলিয়া দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাদের আসা যাওয়া এবং খাদ্যাদির ব্যয়-ভার রাজসরকার বহন করেন। এ-সময়ে সহরের শাসন-ভার গ্রহণ করে ড্রিফাং গোমপার লামা। তাঁহার ইচ্ছাই আইনে পরিণত হয়। তিনি যেরূপ ইচ্ছা এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। ছোট ছোট অপরাধে গুরুতর শাস্তির বিধান হয়। এজন্য ভয়ে ভয়ে ধনী-বাসিন্দারা সহর ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া যান, পাছে সামান্য অপরাধের দায়ে পড়িয়া ধন, মান সমুদয় হারাইতে হয় এই ভয়ে। সহরের গরীব জনসাধারণ অবশ্য সহরেই থাকে। সাধারণতঃ সহরের লোকেরা নোংরাভাবে বাস করে, কিন্তু এ-সময় নূতন কাপড় পরে, বাড়ী-ঘরে চূণকাম করে, এই ভয়ে পাছে

তাহাদের অপরিচ্ছন্নতার দরুন সাজা পাইতে হয়। সেংরাল, দ্রিফাংরা, গ্যালদেন্, গোম্‌পা প্রভৃতি মঠের লামারা যে কয়দিন সহরে বাস করেন, সে কয়দিন রাজসরকারের অর্থে কিংবা ধনী-ব্যক্তিদের অর্থ ব্যয়ে তাঁহাদের সব ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

নববর্ষের উৎসব

নববর্ষের দ্বিতীয় দিবসেও এক প্রকার খেলা প্রদর্শিত হয়। তাহার পনেরো দিন পরে, চিয়াঙ্গা চিঙ্গোপো চিয়াপো নামে একটি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পরের মাসে আর একটি উৎসব হয়। সেই উৎসবের নাম চোংজু সৈওয়াং। এ-সময়ে লামা গ্রাম হইতে একজন তিব্বতীয়কে ডাকিয়া পাঠান। তাহার মুখের একদিকে কালো অপর দিকে সাদা রং মাখানো হয় যেমন আমাদের দেশে চূণ-কালি মাখানোর কথা শুনা যায়। এইরূপ সাদা-কালো রং মাখাইয়া পরে তাহাকে চামড়ার একটা জামা পরানো হয়। তারপর তাকে সহর হইতে স্যামেই নামে একটি গ্রামে পাঠান হয়। এই স্যামেই বা সেতাং নামক স্থানে তাঁহার প্রায় এক বৎসর থাকিতে হয়। সেখানকার একটি গোম্‌পায় তাহার সাতদিন বাস করিবার রীতি। সেই গোম্‌পার নাম মৃত্যু-তোরণ। ঐ গোম্পা বা গোম্ফার ভিতর অজগর সাপের

খোলস এবং বন্যজন্তুর চর্ম্ম এবং নানা ভীষণাকার রাক্ষস ও দৈত্যের মূর্ত্তি থাকে। এমন ভাবে সেই ভীষণ গুহাটি ভয়াবহ জীব-জন্তুর মৃতদেহে ও বিবিধ মূর্ত্তিতে পূর্ণ থাকে যে একটা ঐরূপ গুহার মধ্যে এক সপ্তাহ কাল বাস করা বস্তুতঃই বিপজ্জনক। এই সাতদিন কিন্তু এই লোকটির থাকে অসাধারণ ক্ষমতা। সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এ-সময়ে লামাদের কাছ হইতেই প্রচুর ভিক্ষা মিলে। কেননা সে যে দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দিতে পারে, তাহার এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত হইতেই যে তাহা সপ্রমাণ হয়। পূর্ব্বে এই সব কার্য্যে যাহারা নিয়োজিত হইত, তাহাদের অনেকেরই মৃত্যু হইত, এখন আর তাহা হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেই আবার সে ফিরিয়া আসে।

তিব্বতের শাসন-বিধান এইরূপ: বড় লামা একজন গিয়ালবো (রাজা) ইনিও লামা। চারিজন কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং পাঁচ-জন সদস্য লইয়া তাঁহার শাসন-পরিষদ গঠিত। লামা হইতেছেন তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা। বিশেষ দরকারি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যেমন আপীল ইত্যাদি। তাঁহার মীমাংসাই চরম সিদ্ধান্ত। গিয়ালবো হইতেছেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী; তার পরে কর্ম্মচারীরা প্রধান প্রধান লামাদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, ইহাদিগকে বলে লিঙ্গস্।

সহরের আর একটি ব্যবস্থা বেশ ভাল। নানা দেশের লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ওখানে থাকে, কাজেই ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি যে হইবে তাহাও ত স্বাভাবিক। এইরূপ স্থলে কে বিচার করিবে? প্রত্যেক দেশের লোকদের মধ্য হইতেই একজন সর্দ্দার নিযুক্ত করা হয়, সেই সর্দ্দারই নিজ নিজ দেশীয়দের মধ্যে কোনরূপ গোলমাল হইলে তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। সহরের মধ্যে চুরি, ডাকাতি প্রায়ই লাগিয়া আছে। চোরেরা ও ডাকাতেরা চোরাই মাল নেপালী সওদাগরদের সাহায্যে সরাইয়া থাকে।

অন্যান্য পাহাড়িয়া জাতীয়দের মত তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহারও অনেকটা একপ্রকারের।

এখানকার বিবাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি অদ্ভুত রকমের। এক পরিবারের পাঁচ ভাই হয়ত একটি স্ত্রীলোককেই বিবাহ করিল। এখানে তিন রকমের বিবাহ প্রচলিত।

তিব্বতে, তিন রকমের ভাষার ব্যবহার আছে। খাম-কাই বা খাম ভাষা, লাশার পূর্ব্বদিকের খামদেশের লোকেরা ব্যবহার করে বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে খাম। বোধ্‌কাই ভাষা,—ই-ৎসঙ্গ দেশের লোকেরা ব্যবহার করে। দোয়াগকাই ভাষা ব্যবহার করে নাগরি, খোরশান্‌ প্রভৃতি অঞ্চলের অসভ্য যাযাবরেরা। লাশাতে বোধ্‌কাই ভাষারই সমধিক প্রচলন।

এই ভাষাই হইতেছে রাজভাষা বা সহুরে ভাষা। এই ভাষাতেই তিব্বতীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে।

এ-দেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য হইতেছে সাত্তু বা ভাজি, ভাত, মাছ, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর মাংস। লোকে চা খুব বেশী পান করে। চাং নামে একপ্রকার পানীয় ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। বালি বা 'নির' সঙ্গে নানারূপ মসলা মিশাইয়া এই পানীয় তৈরি করে এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত মাটির বড় বড় জালার ভিতর বন্ধ করিয়া পরে উহা ব্যবহার করে। ইহা এক-প্রকার উত্তেজক পানীয় বিশেষ।

লাশার জলবায়ু খুব ভাল। কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধির কথা ইহারা জানে না। সে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে ১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার লাশাতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এজন্য এখানকার লোকেরা বসন্ত রোগকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখে। তাহারা মনে করে এ পীড়ার কোন ঔষধ নাই, ইহার কোন চিকিৎসাও নাই। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার কথা ইহারা জানে না। যাহারা জানে তাহারাও বিদেশীয়দের কাছে টিকা লইতে অনিচ্ছুক।

তিব্বতে, গম, (নি) সরিষা (নিকাং) দার্ভ (এক প্রকার শস্য) আলু, মূলা, গাজর প্রভৃতি জন্মে।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এখানে দুই শ্রেণীর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত। একটির নাম নাংবা এবং অপরটির নাম চিবা বা বৈস্‌বু (গেন্‌বো)। নিংবাদের মধ্যে আবার নিংমা, সাকিয়া, গাবা, এবং গিলুপা নামে কয়েকটি শাখা-প্রশাখা আছে। লামাদের মৃতদেহ ব্যতীত সকলের শবই ধোতো নামক একটি পর্ব্বতের উপর লইয়া যায় এবং শব টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া আত্মীয় স্বজনেরা চিল, শকুনি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া ফেলে।

এখানে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের পদমর্য্যাদা বংশানুক্রমিক। লাশাতে সানুহু, ফোটাং, দিউরিং, সেটা, ভান্দিশিয়া, রাগাশিয়া, লালু, টোক, পোটিখাংসা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস।

মোঙ্গোলিয়া-যাত্রা

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৯। আজ লাশা ছাড়িয়া মোঙ্গোলিয়ার দিকে রওয়ানা হইলাম। আমাদের যাত্রীদলে ছিলাম ১৫০ জন লোক। তাহাদের মধ্যে ষাট জন ছিল মোঙ্গোলিয়ার অধিবাসী স্ত্রী ও পুরুষ। আর বাকী সব তিব্বতীয়। আমরা ভারতীয় এক দলে ছয় জন। লাশার রামোচিঝিয়ো মন্দিরের তিনপোয়া মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর বাগান আছে। বাগানটির নাম দাব্‌চিলিঙ্গা। বাগানটি দেখিবার মত বটে। আমরা বাগান ছাড়িয়া কতকটা দূরে আসিয়া একটি ছোট দুর্গ পাইলাম। এই দুর্গে কয়েকজন চীনা সৈনিক বাস করে। দুর্গের কাছেই

কুচকাওয়াজের ময়দান। উহার নাম ত্যাবচি। এখানে প্রতি বৎসর দুইদিন তিব্বতীয় সৈনিকেরা রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। ত্যাবচি হইতে এক মাইল দূরে সেরং-রা-গোম্‌পা নামে একটি মঠ। এখানে প্রায় ৫,৫০০ ত্যাবা বাস করে। ইহাদের সর্ব্ববিধ ব্যয়-ভার লাশার রাজসরকার বহন করেন। এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে আমরা একটি ছোট নদী পার হইলাম। এই নদীটি পেন-পো-গো গিরিপথ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া নদীটি কিচুতে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহার অতি কাছে প্যারিসাগা নামে একটি ছোট গ্রাম। মাত্র পাঁচখানি কুঁড়ে ঘর। আর পেন-পো-গো পাহাড়ের উপর কিচাং গোম্‌পা বা মন্দির।

এই ভাবে আমরা ছোট ছোট নদী নালা পার হইয়া অবশেষে লিংবুজোঙ্গ নামে একটি ধ্বংসপ্রায় দুর্গের কাছে আসিলাম। সে রাত্রির মত সেখানেই বিশ্রাম করিলাম। এখানকার পথ বেশ ভাল। চার মাইল পর্য্যন্ত পথ ত খুবই ভাল ছিল। তার পরের পথটি ছিল প্রস্তরাকীর্ণ ও বন্ধুর কিন্তু 'চড়াইতে' তেমন কোন কষ্ট হয় নাই। এখানে ঘোড়া ও গোরুর খাদ্য ঘাস প্রচুর পরিমাণে মিলিয়াছিল।

১৮ই সেপ্টেম্বর। আজ পথ বড় বিশ্রী। খাড়া উঁচু পাহাড়; পথ নাই, কেবল পাথর আর পাথর। অতি কষ্টে দুই মাইল

'চড়াই' উঠিয়া পেন্‌লো-গা গিরিপথে আসিলাম। এই পর্ব্বত-শ্রেণী পূর্ব্বমুখী চলিয়াছে। উচ্চতা হইবে ১৬,৩২০ ফিট। কোন গাছপালা নাই। পাহাড়গুলি একজাতীয় ছোট তৃণে ঢাকা। এই বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ দিয়া আমরা প্রায় ২½ মাইল নামিয়া একটি নদীর পারে আসিলাম। নদীটি রাস্তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাঁ-দিকে বহিয়া গিয়াছে। আরও ৫¾ মাইল পথ চলিয়া আমরা অনেকটা নীচে একটী ছোট গ্রামে আসিলাম। গ্রামের নাম ব্যাঁয়া। গ্রাম হইতে প্রায় ১½ মাইল দূরে দুইটি মন্দির দেখিলাম। একটির নাম ল্যাঙ্গোটা গোম্‌পা অন্যটির নাম নালোন্দা গোম্‌পা। এখানে ১০০ জন ল্যাবা থাকেন।

ব্যাঁয়া গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে ফেম্‌বু-চু নদী পার হইলাম। নদীটি মাত্র ১½ ফিট গভীর এবং পনেরো হাত চওড়া। পশ্চিম দিক্ হইতে বহিয়া আসিয়াছে। এখান হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিচু নদীর সহিত মিলিয়া গিয়াছে। আমরা পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রায় তিন মাইল দূরে নদী পার হইয়া দেবুংসিগা নাইমর নামক গ্রামে আসিলাম। গ্রামে কুড়িখানি ঘর রহিয়াছে। আজ রাত্রি এখানেই ছিলাম। গ্রামটি বেশ সুন্দর। চাষ-বাস বেশ আছে। এখানকার কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্যাদি লাশাতে বিক্রয় করে। কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য ফেমবু চু এবং আরও ছোট ছোট নদী হইতে নালা কাটিয়া আনা হইয়াছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর। আমরা ডেবুন্‌সিগা ছাড়িয়া নদীর কিনারায় কিনারায় উত্তরদিকে চলিতে চলিতে একটী গ্রামে আসিলাম। গ্রামটি ছোট। গ্রামে মাত্র পঞ্চাশ ঘর লোক আছে। এ-গ্রাম হইতে তিনপো মাইল দূরে একটি দুর্গ আছে,—দুর্গটির নাম লাংদাবজন্। এখানে দুইজন জঙ্গপো বাস করেন। ইহাদের উপর পেস্‌পো-পট্রি হইতে পেনপো-গো পর্য্যন্ত যে গিরিপথ আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আছে, আমরা এখান হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে চা-গিরিপথের নিকট আসিলাম। আসিবার পথে প্রায় আধ মাইল উঁচুতে একটি পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেখান হইতে প্রায় তিন মাইল পথ আমাদের চড়াই উঠিতে হয়। এই পথ মোটেই ভাল ছিল না। আমরা অতি ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া তবে চা-গিরিপথে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলাম।

এই পর্ব্বতের উচ্চতা হইবে প্রায় ১৫৮৪০ ফিট। পর্ব্বত-শ্রেণী পশ্চিমদিক হইতে আসিয়াছে। এইখানে আমরা কয়েকটি পার্ব্বত্য নদীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। চা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আসিয়া তালুংগোম্‌পা বা মাংতাঙ্গে আসিলাম। এইখানে তিব্বতের প্রসিদ্ধ লামা মারিংবোচি বাস করেন; প্রায় তিনশত লামাও এখানে থাকেন। রাস্তাঘাট প্রস্তরময়।

২০শে সেপ্টেম্বর। আমাদের তাঁবু যেখানে ছিল সেখান হইতে মাত্র ৩০০ পা দূরে তালুংচু নামে একটি নদী বহিয়া যাইতেছিল। নদীটি ৩০।৩৫ হাতের বেশী চওড়া নয়, গভীরতাও দুই হাতের বেশী হইবে না। তালুংচু উত্তর-পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া কীচু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ফোনড়ু নামক দুর্গ অবস্থিত। সেখানে পঞ্চাশখানি বাড়ী হইবে। এই দুর্গ, তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নদী তিনটিই বেশ খরস্রোতা।—ইহাদের নাম যথাক্রমে রোং, মিগি এবং তালুং। রোং বেশ বড় নদী, প্রায় ৪০ হাত চওড়া হইবে। ইহার আবার দুইটি শাখা নদী আছে, একটির নাম গ্যাম। এই নদীটি তিব্বতের গ্যাম্ জেলা হইতে বহিয়া আসিয়াছে। অন্যটির নাম লানি। লানি গিরিপথ দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া ফোনড়ু দুর্গ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে গ্যাম নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। নিন্‌চিন্-থ্যাংলাহা পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে আর একটি নদী বহিয়া আসিয়াছে, এই নদীটি স্যাংগহাং জেলার মধ্য দিয়া অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া তালুংচুর সহিত মিলিত হইয়াছে। দুর্গের কাছে এই তিনটী নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু আগে একটী লোহার পুল আছে। পুলটী প্রায় ৮০ হাত লম্বা হইবে। বর্ষার সময় নৌকা ছাড়া নদী পারাপার চলে না। এখানকার নৌকা কাঠের কাঠামোর

উপর চমরী গোরুর চামড়া দিয়া মুড়িয়া তৈয়ার করা হয়। আমরা দুর্গের কাছে পর্ব্বতের যে মাপ লইয়াছিলাম তাহা হইতে দেখা গেল যে সমুদ্র-সমতা হইতে উহার উচ্চতা ১৩,৩৪০ ফিট হইবে।

আমরা এখান হইতে কেবলই চড়াই উঠিতে লাগিলাম। এই পথে, পথ বলিয়া কিছুই নাই—পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে পথ চলিয়াছে তাহা গ্রামবাসীদের চলার জন্যই হইয়াছে। সেই পথেই প্রায় ৬ঃ মাইল চড়াই উঠিয়া আমরা চ্যামচুনাং নামক গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামটি যেন স্বপ্নরাজ্যের নিঝুমপুরী। কোন লোকজন নাই। নীরব নির্জ্জন পথ—এমন জনপ্রাণী-হীন কোন গ্রাম আর পূর্ব্বে বড় বেশী চোখে পড়ে নাই। গ্রামটী মিগি নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত—ঘাস এবং জ্বালানী কাঠ এখানে খুব পাওয়া গেল—প্যাদাম্ নামে এক জাতীয় চীরতরু এখানে সংখ্যায় অনেক দেখিলাম। পথ যেমন বন্ধুর, তেমনি সঙ্কীর্ণ, তবে এখান হইতে অনেকটা আগে পথ বেশ চওড়া এবং সমতল পাইয়াছিলাম। নালুং জেলা চ্যা গিরিপথ হইতে ফোন্‌ড়ু দুর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মিগি নদীর দক্ষিণ পারে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে এবং ফোন্‌ড়ু দুর্গ ও চ্যানচুনাং পর্য্যন্ত যে ভূভাগ তাহাকে বলে ফোন্‌ড়ু জেলা।

২১শে সেপ্টেম্বর। আজ আমরা আরও দূরে প্রায় দুই মাইল হইবে একটী ছোট গ্রামে আসিলাম। গ্রামটীর নাম

চিওমু-ল্যাকাং। এখানে একটী ছোট মন্দির দেখিলাম,—মন্দিরটির নামও চিওমুল্যাকাং। এই ছোট গ্রামখানি মিগি নদী ও আর একটী অনামা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে একটী খুব বড় গোম্‌-পা আছে—সেখানে প্রায় দুইশত জন দ্যাবা বাস করেন। আমরা এই পথে এই শেষ চাষবাস দেখিলাম। অনেক ছোট ছোট নদী ও নালা পার হইয়া তিন মাইল দূরে মোণিও গিরিপথে আসিলাম। আমরা দেখিলাম স্ফুটনাঙ্ক ১৪,৯৬০ ফিটে দাঁড়াইয়াছে।

এই গিরিপথটী আমাদের বেশ মনোরম মনে হইয়াছিল। যেমন সৌন্দর্য্য তেমনি চড়াই, উৎরাইতে উঠিতে নামিতেও অসুবিধা ছিল না। আমরা এখান হইতে আধ মাইল দূরে লানিতেসাম নামক একটী গ্রামে রাত্রি কাটাইলাম। এইস্থানে দেখিলাম পাহাড়ের ঢালু গায়ে প্রায় পঞ্চাশটী তাঁবু খাটানো। একদল অসভ্য যাযাবর লোক আসিয়া এই গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। ট্যাসাম নামে লাশার একজন সরকারী কর্ম্মচারী এই যাযাবর জাতিদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। ইহাদের কাছ হইতে লাশা সহরে ঘোড়া এবং চমরী গোরু চালান দেওয়া হয়। ট্যাসাম তাঁহার কার্য্যের জন্য লাশার রাজসরকার হইতে কোনরূপ বেতন পান না। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কিছু জমি-জমা দেওয়া হয়। যাযাবরেরা এখানকার জমিতে নিজেদের চমরী গোরু

এবং ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি বিনা শুল্কে চরাইতে পারে। ট্যাসামের দায়িত্ব বড় কম নয়। যে সকল গোরু ও পণ্যদ্রব্যাদি এই পথে লাশা যাইবে, পথে যাহাতে উহাদের কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারে সে দায়িত্বটা সম্পূর্ণভাবে ইহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। আমরা যাযাবর জাতিদের তাঁবুগুলি দেখিলাম। এক অদ্ভুত রকমের চমরী গোরুর কালো রঙের কর্কশ চামড়া দিয়া তাঁবুগুলি ছাওয়া। তবে বৃষ্টি বাদল এবং বরফের আক্রমণ হইতে এইগুলি নিরাপদ। এ সময়ে খুব বরফ পড়িতেছিল—চারিদিকের পাহাড়, পর্ব্বত এবং আমাদের তাঁবুর কাছটা প্রায় এক ফুট গভীর বরফে ঢাকিয়া গিয়াছিল। জ্বালানী কাঠ এবং পশুর খাদ্য পাওয়া দুরূহ হইয়াছিল।

২২শে সেপ্টেম্বর। আজ আমরা লানিটেসাম হইতে লানি গিরিপথে আসিলাম। চড়াই ২½ মাইল, কিন্তু বেশ সহজ ছিল। গিরিপথের মধ্যে আমরা যে স্ফুটনাঙ্ক লইয়াছিলাম তাহা হইতে দেখা গেল এই স্থানের উচ্চতা ১৫, ৭৫০ ফিট। লানি গিরিবর্ত্ম অতি সুন্দর। এই পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে চাহিলে যে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা চোখে না দেখিলে ভাষায় বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে না। অতি দূরে দূরে চিরস্থায়ী শুভ্র-তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গগুলি শোভা পাইতেছে, তাহাদের দণ্ডে দণ্ডে রূপ

পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে চিত্তকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। একটী গিরিনদী এই গিরিপথ দিয়া দক্ষিণ দিকে নামিয়া গিয়াছে—তাহার চঞ্চল গতি এবং কোন কোন স্থানে জলপ্রপাতের সৃষ্টি, আমাদের মন আনন্দে অভিভূত করিয়াছিল।

আমরা এখান হইতে গ্যামে চুচাম্ নামক স্থানে আসিলাম। এখানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এখানকার লোকেরা প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া এই প্রস্রবণের জলে স্নান করে। এই কুণ্ডটি ২১ ফিট লম্বা এবং দুই ফিট গভীর হইবে—সকল সময়ই উষ্ণ জলে পূর্ণ থাকে ; এই কাঁচা কুণ্ডের ভিতর স্নানার্থীরা গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখে, কপাল দিয়া যখন ঘাম বাহির হইতে থাকে সে সময় তাহারা প্রস্রবণের জল হইতে উঠিয়া আসে এবং একটা মোটা কম্বলে সারা শরীরটা ঢাকিয়া কয়েক মিনিটের জন্য শুইয়া থাকে, তারপর তাহারা একপ্রকার দেশীয় উত্তেজক পানীয় কিংবা কিছু খাবার খায়। এই উষ্ণ প্রস্রবণের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল দূরে আরখোরসেন্ নামে এক গ্রামে তিনটী কাঁচা বাড়ী আছে। এ বাড়ী কয়টি পর্য্যটকদের ব্যবহারের জন্য, আর একটী খোরসেনের জন্য। এখানে "খোরসেন" কথাটার অর্থ বুঝাইয়া বলিতেছি। খোর বা খোরলো—খোরীয় শব্দটা ঢাকের মত একটা গোলাকার পদার্থকে বুঝায়। ঐটী কাগজের তৈয়ারী লাল রংএর খুব পাতলা চামড়া দিয়া মোড়া। তাহার গায়ে

তিব্বতীয়দের মন্ত্র লেখা আছে। সেইটী হইতেছে 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ'—এই অক্ষর কয়টী সোণালী রংএ কিংবা লাল রংএ খুব বড় বড় করিয়া লেখা থাকে। কাগজের বেড়ের গায়েও এই মন্ত্র লিখিত থাকে। ইহার ভিতর দিয়া একটী লৌহ শলাকা ফুঁড়িয়া দিয়া খাড়া করিয়া রাখা হয় এবং উহার সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হয় তারপর উহা ঘুরানো হইতে থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এই খোর সর্ব্বদা ঘুরানো অবস্থায় রাখিতে পারিলে খুব পুণ্য হয়।

আমরা এই স্থান হইতে খানিকটা উত্তর-পূর্ব্ব দিকে এবং খানিকটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যাইয়া হ্যাম্ উপত্যকায় আসিলাম। চারিদিকে বড় বড় পাহাড় সব মাথা উঁচু করিয়া আছে আর মধ্যখানে এই সুন্দর উপত্যকাটী অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১৫ মাইল এবং চওড়াও হইবে প্রায় ৫ মাইল। ছোট একটী নদী নাম তার হ্যাম্, বিশ হাত চওড়া এবং ২ ফিট গভীর, কল্‌কল্ করিয়া এই উপত্যকার মধ্য দিয়া অশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীটি রোং নদীর একটী শাখা। আমাদের তাঁবুর কাছ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে একখানি পাকা বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে চিগের অর্থাৎ হ্যাম্ উপত্যকার শাসনকর্ত্তা লম্বরদার মহাশয় বাস করেন। এখানেও যাযাবরদের প্রায় ২০০ কালো কালো তাঁবু দেখিলাম—ইহারা এখন গোরু, ঘোড়া, চমরু, ছাগল ইত্যাদি চরাইয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবসায়-

বাণিজ্যও করে। বূল্ নামে এক প্রকারের সোডা এবং লবণ ইহারা তেংরীনোর হ্রদের তীর হইতে লইয়া আসে এবং তাহার বদলে লাশা হইতে কাপড় এবং খাদ্য শস্য লইয়া বাড়ী ফিরে। ইহা ছাড়া তাহারা চমরী গোরু, ছাগল, ভেড়া, টাটুঘোড়া, মাখন এই সকলের বিনিময়েও বেশ পয়সা রোজগার করে।

আমাদের সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত যে যাযাবরদের দেখা হইল তাহারা সকলেই তিব্বতীয়। দেখিতে খুবই বলিষ্ঠ, যুদ্ধ করিতে ভালবাসে,—ইহারা লাশা রাজসরকারের প্রজা। এই পার্ব্বত্য উপত্যকা পশুর চারণক্ষেত্ররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার যিনি প্রধান লামা তাঁহার তিনশত ঘোটকী আছে। এই ঘোটকীগুলি চীপোন্ নামে আস্তাবলের মালিক বা সহিসের অধীনে প্রতিপালিত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক দিন ঘোটকীগুলির দুধ দোহান হয়। সেই দুধ হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়—এই উৎকৃষ্ট পানীয় বা মাদক দ্রব্য লামারা ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাও সকল লামা পারেন না। একমাত্র প্রধান লামাই পারেন। এখান হইতে দুই দিনের পথ হইবে টেংরীনোর হ্রদ বা নাম হ্রদ। আর সেই হ্রদের তীর হইতে উত্তর দিকে দশ দিনের পথ চলিলে দেখিতে পাওয়া যায় নানা জাতীয় অসভ্য ও বর্ব্বর মানুষদের দেশ (Wild people) এই বন্য মানুষেরা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে বাস করে। ইহাদের কাছে যাওয়া বড় নিরাপদ নয় আর সম্ভবপরও নয়

বলিয়াই শুনিলাম। আমরা খোরসেনে দুই দিন ছিলাম। এই সুন্দর উপত্যকার উচ্চতা হইবে ১৭,৪৬০ ফিট, অক্ষাংশ ৩০° ৩০´ ৫৫´´।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯। আজ আরখোরসেন্ ছাড়িলাম। চারি মাইল, ৫½ এবং ৬½ মাইল পথে একে একে চারিটী নদী পার হইলাম। এই নদী চারিটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে বহিয়া আসিয়াছে। সম্মুখেই চিয়োক্‌চি গিরিপথ। এই পথটির চড়াই তেমন কঠিন নহে। নামিতেও তেমন অসুবিধা হয় নাই। পথে এক জায়গায় চারটি অরক্ষিত "চুরতান্" দেখিয়াছিলাম। এই গিরিপথ ছ্যাম জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। ক্রমাগত ২৩ মাইল পথ চলিলাম। পথে লাইচু নদী পার হইয়াছিলাম। এই নদী টেঙ্গরি হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২৩ মাইলের কাছাকাছি আসিয়া দূরে পোটামোলাম গিরিশৃঙ্গ দেখিলাম। তাহার মাথায় চিরতুষার শ্রেণী শোভা পাইতেছে। পথ বেশ ভালই ছিল। আমরা লাইচু নদীর বাম তীরে রাত্রি কাটাইবার জন্য তাঁবু গাড়িলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর।—আজ চব্বিশ মাইল পথ চলিলাম। পথে মিগি নদী পার হইতে হইল। জলের গভীরতা ২½ ফিট, নদীর চওড়া হইবে ৫০ হাত। উত্তর দিক্ হইতে এই নদীটি বহিয়া আসিয়াছে। এই পথে খান্‌সা নামে একটি চিরতুষারা-

বৃত গিরিশৃঙ্গ দেখিয়াছিলাম। আমরা নদীর তীরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে তাঁবু ফেলিলাম। অদূরে একটি গিরিবর্ত্ম। কাছাকাছি নানা বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের তাঁবুও পড়িয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর। আমরা আজ বেশ সমতল ও প্রশস্ত পথ ধরিয়া ১৯½ মাইল পথ আসিলাম। ইউ নামে একটি নদী পার হইলাম। এই সুন্দর নদীটী আমরা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিলাম, সেই পথ হইতে অল্প কিছু দূরের একটী হ্রদ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ইউ নদী খানিকটা উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়া নাগচু বা নাগা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীর তীর হইতে চারি মাইল দূরে ইউ গিরিপথ। যে হ্রদ হইতে নদীর উৎপত্তি, শুনিলাম সেই হ্রদটির বেড় হইবে প্রায় ৩২ মাইল, এবং চওড়া হইবে ৮ মাইল। আমরা কিন্তু এই হ্রদটি দেখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখান হইতেও দুইটি চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিলাম। একটির দূরত্ব এস্থান হইতে প্রায় ৩৭ মাইল, অপরটির দূরত্ব হইবে প্রায় ৪০ মাইল।

২৮শে সেপ্টেম্বর। ৫½ মাইল পথ চলিয়া একটা সোজা চড়াই পার হইলাম। সম্মুখে পড়িল খোরশেন্ গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্ম হইতেছে শাংস্থং জেলার উত্তর সীমা। এখানে যাযাবর জাতির প্রায় ৫০০ শত তাঁবু পড়িয়াছে দেখিলাম। ১৪½ মাইল পথ পার হইলে পর আমরা নাগা নদী পার হইয়া তাহার বাঁ পারে

আসিলাম। এখানে নদীর গভীরতা হইবে ২½ ফিট আর চওড়া হইবে ৪০ পা। এইবার আমরা নিরাপদে খোরশেনে আসিলাম। রাত্রি এখানেই কাটিল। এখান হইতে একটি পথ বরাবর শিনিফুং বা শিলং চলিয়া গিয়াছে। শিনিংফু চীন-সম্রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত একটি বেশ বড় সহর। কোকোনার হ্রদ হইতে ঐ সহরের দূরত্ব হইবে প্রায় ৬০ মাইল। আমরা একটা ঘোরা পথে চলিলাম। আমাদের এ যাওয়ার উদ্দেশ্য শিয়াবদনে গোমপাতে পৌছান। কেননা আমাদের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল, ঐখান হইতে রসদাদি কিছু সংগ্রহ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন।

২৯শে সেপ্টেম্বর। প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিয়া আমরা হোর জেলায় আসিলাম। এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে শিয়ার-দেন গোমপায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এই গোমপায় একশত জন ল্যাবা বাস করেন। গোমপার চারিদিকে প্রায় দেড়শত ঘর এবং তাঁবু দেখিলাম। এখানে জং-পোংএর থাকিবার জন্য বেশ বড় বাড়ী আছে। শিয়াবদীন গোমপা নাগচুখা জেলায় অবস্থিত। ঘাস এখানে প্রচুর মিলিল, এই জেলায় প্রায় তিন হাজার যাযাবরদের শিবির আছে। এখানে এমন কতকগুলি জাতি আছে, যাহাদের চুরি, ডাকাতি করাই হইতেছে ব্যবসায়।

এখানে শীত খুব বেশী। ১,৭৯৩০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে এই গোমপা অবস্থিত। এখানে খাওয়া

খাওয়ার জিনিষ পত্র বেশ পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় রূপার টাকা এ অঞ্চলে চলে। এখানকার টাকা দুই প্রকারের হয়। একটির নাম "চ্যাঙ্গা পৌলাং"। চ্যাঙ্গা পৌলাং হইতেছে পুরানো রকমের টাকা। ইহার ওজন ½ তোলা। আর এক শ্রেণীর টাকার গায়ে শাসনকর্ত্তার নাম খোদিত। ওজন ½ তোলা। এই দুই রকমের টাকারই কিন্তু দাম সমান। ভারতীয় মুদ্রার ।৵০ আনার সমান। ইহার নাম "টঙ্কা"। টাকার বদলিতে টাকা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতীয় মুদ্রারও প্রচলন আছে। আমরা শিয়াবদীন গোম্‌পায় তিন দিন কাটাইয়াছিলাম।

২রা অক্টোবর। শিয়াবদীন গোম্‌পা হইতে পাঁচ মাইল দূরে খাইগার লা গিরিপথ পাইলাম। আমাদের এই পথে চলিতে তেমন ক্লেশ হয় নাই। এই গিরিপথের দুই মাইল উত্তরে মোরা নামে একটি হ্রদ অবস্থিত। হ্রদটির দৈর্ঘ্য ২ মাইল এবং চওড়া ১½ মাইল। এই হ্রদের চারিদিকের সমতল ভূমিতে বর্ব্বর যাযাবর জাতিদের বাস। হ্রদের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া একটা রাস্তা ভ্যা-ডিয়েং-প চলিয়া গিয়াছে। ঐখানে মস্ত বড় চায়ের বাজার। আমরা এই গিরিপথ হইতে একটু দূরে সরিয়া রাত্রি কাটাইলাম।

দস্যু-ভয়

৩রা অক্টোবর। ৩½ মাইল পথ চলিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে খারশেনে আসিলাম। আমরা এখানে আসিয়া শুনিলাম জামা

জেলা হইতে একদল অশ্বারোহী দস্যুদল তেঙ্গরিনোর হ্রদের দিক হইতে লুঠতরাজ করিয়া এদিকে আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে ১০০ শত টাট্টু ঘোড়া, ৩০০ শত চমরী গোরু, ৫,০০০ হাজার ভেড়া ও ছাগল রহিয়াছে। আমরা এই দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয় দস্যুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য -পথ হইতে দূরে থাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রায় দুই মাইল পথ অতি দ্রুত চলিয়া আমরা একটি মোঙ্গোলিয় বাণিজ্যযাত্রী দলের কাছে আসিলাম। আমরা পূর্ব্বে এই দলের সহযাত্রী ছিলাম। ইহারা পশু-চারণের জন্য পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। দস্যুদল চলিয়া গেলে পর পুনরায় বেলা চারিটার সময় আমাদের যাত্রা সুরু হইল। প্রায় ২½ মাইল পথ চলিয়া সোজা পথ ধরিলাম। সে পথেও প্রায় ২½ মাইল চলিয়া আমরা একটী পাহাড়ের পায়ের তলায় আসিলাম। এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে বোরাচিং ৯৮½ তে সুতোদাম পারাবজ্ নামে একটি তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম।

৭ঠা অক্টোবর। প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিয়া একটি নদী পার হইলাম। নদীটির গভীরতা ১½ ফিট, চওড়া মাত্র ১২ পা। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে। ৫½ মাইল দূরে আমরা ত্যাংস্যং গিরিবর্ত্ম পার হইলাম। এই গিরিবর্ত্মটী

নাগচুখা এবং জামা জেলার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। জামাতে প্রায় ১,৫০০ যাযাবরদের শিবির রহিয়াছে। এই জেলার শাসনকর্ত্তা হইতেছে চীনা আম্‌বান্‌রা। উহারা সিনিংফুতে থাকে।

৫ই অক্টোবর জিয়ারোতে আসিলাম। এখানকার উচ্চতা ১৪,৫৪০ ফিট।

বর্ব্বরের দেশে

৬ই, ৭ই অক্টোবর। ক্রমাগত চলিতে চলিতে ৮ই অক্টোবর ট্যাঙ্গি পর্ব্বতশ্রেণীর কাছে আসিলাম। এখান হইতে নিকটে ও দূরে চিরতুষারাবৃত কয়েকটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। আমরা অতি কষ্টে ট্যাঙ্গা গিরিপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথটি প্রায় দুই ফিট্ গভীর বরফে ঢাকা ছিল। সম্ভবতঃ পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে বরফ পড়িয়া এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ট্যাঙ্গা পর্ব্বতশ্রেণী বিশেষ দায় -পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এবং এই গিরিশ্রেণীর গায়ে অনেক চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাগরা জেলার ইহা উত্তর সীমা। এ অঞ্চলে প্রায় ১,০০০ হাজার যাযাবরদের শিবির আছে।

ট্যাঙ্গা গিরিবর্ত্ম হইতে প্রায় ১০০ একশত মাইল দূরে আমদো জেলা। এখানে মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য অসভ্য যাযাবরেরা

বাস করে। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে এক অসভ্য ও বর্ব্বর জাতীয় লোকের বাস। ইহারা কাপড় পরিতে জানে না। পশু-চর্ম্ম পরিধান করে। এই বন্য মানুষেরা বন্যপশু শিকার করিয়া তাহারই কাঁচা মাংস খায় এবং তাহারই চর্ম্ম পরিধান করে। সময় সময় আগুনে মাংস একটু মাত্র ঝলসাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকে। তাহারা শাক্‌সব্জী খায় না। রাঁধা জিনিষ খাইতে দিলেও খায় না, উহা খাইলে তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইহাদের আকৃতি অতি ভীষণ। এই অসভ্যেরা চামড়ার তৈরি তাঁবুতে বাস করে।

দাম এবং জাগরা জেলার লোকেরা মোটামুটি মাংস ও সাত্তু খাইয়া জীবন ধারণ করে। এ অঞ্চলে গাছপালা কিছুই জন্মে না। চমরী গোরুর এবং বন্য পশুর শুষ্ক পুরীষই হইতেছে এখানকার একমাত্র অগ্নি জ্বালাইবার উপাদান। ঘাস এখানে প্রচুর মিলে। এই দেশের উত্তর দিকে জনমানবের বসতি নাই। এমন কি অতি বড় বর্ব্বর জাতীয় লোকেরাও সেখানে বাস করে না। স্ফুটনাঙ্ক দ্বারা গণনা করিয়া দেখিলাম এখানকার উচ্চতা হইতেছে ১৬,৩৮০ ফিট।

এখানে অনেক বন্যজন্তুর বাস। তাহাদের মধ্যে ডোং, বন্য চমরী গোরু, একো-বন্য মৃগ। গোয়া-স্যামোয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট হরিণ, বন্য ছাগল, নেন্‌ বা বন্য পার্ব্বত্য ভেড়া, সিয়াঙ্গ

স্যাকড়ে বাঘ, হাগি এক জাতীয় শৃগাল, ঈ,---বন্য বিড়াল, কিলয়াং বুনো গাধা।

রিগোং—খরগোষ। আবোরা ল্যাজবিহীন ইন্দুর, ডেমো ধূসর ভল্লুক। ডেমোর আবার অন্য একটি জাতি আছে তাহার নাম মাইড্। ইহাদের পা ত্বইটি ঠিক্ মানুষের মত। এই জাতীয় ভাল্লুকেরা ভয়ানক হিংস্র হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদিগকে মানুষের মত সোজা হইয়া চলিতে দেখা যায় এবং ঐভাবে সোজা হইয়া মানুষের মত পথ চলিয়া মানুষকে কাছে পাইলেই আক্রমণ করে। রাত্রিকালে এই দুর্গম স্থানে তিন ফিট গভীর বরফ পড়িয়াছিল। এই যায়গাটি ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। বন্য-পশুর আক্রমণের ভয়ও যেমন, তেমনি দস্যু-ডাকাতদের আক্রমণের আশঙ্কাও বড় একটা কম ছিল না। এই জন্য আমরা দশজন, দশজন করিয়া এক একটি দল বাঁধিয়া সারা রাত্রি পাহারা দিয়াছিলাম।

৯ই অক্টোবর। আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। মাত্র ছয় মাইল পথ গিয়াছি, এইরূপ সময়ে একদল অশ্বারোহী দস্যুর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র পাঁচজন। দস্যু কয়জন আমাদের কাছে আসিয়া পড়িলে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? দস্যুরা বলিল যে তাহারা জাগরা অঞ্চল হইতে আসিতেছে। এই দস্যুদল আমাদের সঙ্গীয় পশুদল অপহরণ করিবার জন্য অনেক

দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারা আমাদের সতর্কতার জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তারপর তাহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

আমরা প্রায় পনেরো মাইল পথ চলিয়া একটি হ্রদের কাছে আসিলাম। হ্রদটির বেড় হইবে প্রায় ৭ মাইল। আমরা হ্রদের কাছ দিয়াই চলিলাম। হ্রদের বুকে সুন্দর স্বচ্ছ নীল জল, টল টল করিতেছে। হ্রদের নিকট হইতে আমাদের প্রায় দুই মাইল অন্তর দিয়া ৫½ মাইল পথের পর একটি গিরিপথ উত্তীর্ণ হইতে হইল। এ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল পথ দিয়া চলিতেছিলাম, ক্রমে পথটি উচ্চ হইতে উচ্চতে দিব্য অল্প একটু 'চড়াই'য়ে পরিণত হইল। একটু উঠিয়াই অপর একটি গিরিবর্ত্ম পার হইলাম। এইবার কিন্‌হাপচিগা নামক স্থানে আসিলাম। আমরা এখানে রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করিলাম। ১০ই তারিখ ১৪½ মাইল পথ হাঁটিয়া সেদিনের মত বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম। এখানকার দৃশ্য ছিল পরম রমণীয়। মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে দুইটি চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বুকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি সুন্দর দৃশ্য! আকাশ ছিল নির্ম্মল নীল। চারিদিকের বিস্তৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এখানকার গিরিশৃঙ্গগুলি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল

লবণের নদী

১১ই অক্টোবর, ১৮৭৯। সাড়ে চারি মাইল মাত্র পথ চলিয়াই একটি ছোট নদী পার হইলাম। নদীটির নাম দি-চূ বা থোক্থো। নদীটির কাছেই একটি ছোট সুন্দর হ্রদ। হ্রদের জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি মিষ্টি। আমরা এই হ্রদের তীরে রাত্রি কাটাইলাম। এখানে আসিয়া আর কোন দিকেই পথ পাইতেছিলাম না। এ সময়ে আমাদের অভিযাত্রীদলকে কয়েকজন মোঙ্গোলীয় পথ-প্রদর্শক পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাহারা এক একটি গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া কোন্ দিকে কোন্ পথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা চিনিতে পারিয়াছিল।

১২ই অক্টোবর। আড়াই মাইল মাত্র পথ চলিয়া আসিবার পরই আমরা প্রায় ষোল মাইল দূরে দুইটি তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। অতি চমৎকার দৃশ্য। নীল আকাশের গায়ে ধবল-তুষার-বিমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের শোভন সৌন্দর্য্য না দেখিলে বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে না। ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গ দুইটির মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কিছু দূর যাইয়াই মারাস্ নদীর সাক্ষাৎ মিলিল। এই নদীটি টেঙ্গরিনোর হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং চীনদেশের বহুস্থানকে উর্ব্বর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীটি এখানে সপ্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া সাত দিকে বহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি

শাখাই ৪০ হাতের বেশী চওড়া হইবে না। এই বৃহত্তম নদীটি তাহার মধ্যস্থ দ্বীপ ইত্যাদি সহকারে ৮০০ পায়ের বেশী প্রশস্ত হইবে। তবে গভীরতা তেমন বেশী নাই। তিন ফিটের অধিক গভীরতা কোথাও নাই। শাখা নদীগুলির তীর কর্দ্দমময়। আমাদের একটা ঘোড়ার নদী পার হইবার সময় বুক পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। কোনরূপে আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম।

নদীর পার একরকম কাঁটা-গুল্মে ঢাকা ছিল। তিব্বতীয়েরা ইহাদিগকে 'তারু' বলে। এই গুল্মগুলি এক ফুট পরিমাণ উচু হয়। নদীর পারেই জন্মিয়া থাকে। এই নদী এইখানে তিব্বত ও চীন সীমান্তরেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমরা উচ্চতার পরিমাণ করিলাম। স্ফুটনাঙ্কে দেখিলাম উচ্চতা হইবে ১৪,৬৬০ ফিট্। আমরা চলিতে চলিতে একটি গিরিপথ পাইলাম। এই পথটি বেশ একটু কঠিন চড়াই। গিরিবর্ত্মটি পার হইয়া পাঁচ মাইল পথ চলিয়া প্রায় ৩৭ মাইল দূরে আবার একটি তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। আমরা বুখমাঙ্গনি নামক একটি স্থানে রাত্রির মত বিশ্রাম করিলাম। আমরা যতই নদীর বাঁ পার দিয়া চলিতেছি, ততই মিষ্টি জল আর পাইতেছি না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পথের গিরিশৃঙ্গের উপর কিংবা সমতল ভূমিতে কোথাও গাছ-পালা

কিছুই নাই। তবে একপ্রকার ঘাস জন্মে। চমরী গোরুর পুরীষই একমাত্র জ্বালানী কাঠের কাজ করে।

১৩ই অক্টোবর। আজ উলাঙ্গমিরস্ নামে একটি বড় নদী পার হইলাম। এখানে নদী প্রায় ১,২০০ হাত প্রশস্ত হইবে। গভীরতাও ৩½ ফিটের ন্যূন নহে। উচ্চতাও হইবে ১৫,৬৭০ ফিট্। এখান হইতে আমরা কাগ্‌চিনার নামক স্থানে আসিয়া তাঁবু খাটাইলাম। এখানে অনেকগুলি সুমিষ্ট জলপূর্ণ কুণ্ড পাইলাম। আজ আমাদের পথটি ছিল অতি সুন্দর। দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণী দেয়ালের মত বহিয়া চলিয়াছে, আর সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ।

১৪ই অক্টোবর। ১০½ মাইল পথ চলিয়া আমরা চ্যাচু নামক লবণের নদীর কাছে আসিলাম। এই নদীটি উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। আমরা এই পথে চলিতে চলিতে ৫½ মাইল দূরে পুনরায় চ্যাচু নদী পার হইলাম। জল একেবারে লবণাক্ত, মুখে দেওয়া যায় না।

নদীটি ২০ পায়ের বেশী চওড়া নয়, গভীরতাও তিন ফুটের অধিক নহে। এই নদীটি তুঙ্গাবুড়া পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহিয়া আসিয়াছে। এখান হইতে ১৭ মাইল দূরে একটী তুষারাবৃত-গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পথে আরও ৭½ মাইল অগ্রসর হইয়া তুঙ্গাবুড়া পাহাড়ের নীচে বিশ্রাম

করিবার ব্যবস্থা করিলাম। এখানে প্রায় এক ফুট পরিমাণ বরফ পড়িয়াছিল। পথটী বেশ ভাল, সে কথা আগেই বলিয়াছি।

১৫ই অক্টোবর। ৫½ মাইল পথ চলিয়া আমরা চাচু বা লবণের নদীর সহিত আর একটী নদীর সঙ্গমস্থলে পৌছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নদীর সঙ্গমস্থলের জল বেশ সুস্বাদু। আমরা এখান হইতে ৭ মাইল মাত্র পথ চলিয়া হুঙ্গবুড়া-ন্যাডামো নামক স্থানে অবস্থান করিলাম। আমাদের এখানে দুই দিন থাকিতে হইয়াছিল, কেননা দুই রাত্রি ক্রমাগত বরফ পড়ায় পথঘাট সব ঢাকিয়া গিয়াছিল সেই জন্য পথ-ঘাটের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন পরে বরফ পড়া একটু কমিলে পর পথের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু সে পথ প্রস্তরাবৃত ও সংকীর্ণ ছিল।

১৭, ১৮ এবং ১৯শে অক্টোবর। এই তিন দিন ক্রমান্বয়ে পথ চলিয়া আমরা কোকোশিলি নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এখানকার উচ্চতা হইবে প্রায় ১৩,৪৩০ ফিট। এ সময়ে দিন-রাত্রি সমান ভাবে বরফ পড়িতেছিল। আমরা এখানে বাধ্য হইয়া দুই দিনের জন্য আট্‌কা পড়িয়া গেলাম। আমাদের সঙ্গীয় পশুগুলি বরফের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। এজন্য আমাদের সহযাত্রী বণিকগণের সহিত অগ্রসর হইবার সুযোগ ছিল না। এখানে দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না সেজন্য আমরা এই দারুণ

তুষারপাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা এক স্থানে অবস্থান করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। তিনটী ঘোড়ার পীড়া হইয়াছিল—দুইটী বাঁচিয়া উঠিল, একটি মারা গেল।

১১শে অক্টোবর। সাত মাইল পথ চলিয়া আমরা একটা হ্রদের কাছে আসিলাম। হ্রদের জল প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল, বাকী জলটা বেশ সুমিষ্টই ছিল। আমরা হ্রদের পারেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম।

১২শে অক্টোবর। প্রায় ২১ মাইল পথ চলিতে চলিতে আমরা একটা ছোট হ্রদের ধারে আসিলাম। আমাদের সহিত এই হ্রদের তীরে একদল মোঙ্গোলীয় বণিকদলের সহিত সাক্ষাৎ হইল - তাহারা লাশা যাইতেছিল। এই দলে স্ত্রী পুরুষ প্রায় ১৫০ লোক ছিল। ৬০টি উট ও ১০০টি ঘোড়া ছিল। আমরা তাহাদিগকে আমাদের দলের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে দেখে নাই বলিল, পরে স্বীকার করিল যে মাচু নদীর ধারে তাহারা দলটি দেখিয়াছে, তবে উহা পশুপাল বলিয়া মনে করিয়াছিল। আমাদের কথা শুনিয়া তাহারা বলিল যে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা বণিক্‌যাত্রীর দল হইবে।

এই পথের একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে যাত্রীদল পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিশেষ সহানুভূতিশীল। একদল অন্য এক বিপন্ন দলকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আমাদের

এই যাত্রীদল নানাভাবে সাহায্য করিতে আসিলেন। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যাদি দিতে চাহিলেন, আমরা ইহাদের নিকট হইতে মাত্র পাঁচ সের সাত্তু লইয়াছিলাম।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মা-চু বা চুমার নদীর তীরে আসিলাম। হ্রদ হইতে ইহা মাত্র ৪½ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা নদী পার হইবার জন্য খেয়া নৌকার খোঁজ করিতে লাগিলাম কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

নদীটীর জল প্রায় আধাআধি জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল। তবে উহার উপর দিয়া মালপত্র, ঘোড়া ও লোকজন লইয়া পার হইবার মত বরফ কঠিন না হওয়ায় আমরা একটা চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। কি ভাবে পার হইব তাহাই হইল চিন্তার বিষয়।

যাযাবরের দেশ

আমরা ২৭শে অক্টোবর তারিখ, এগার মাইল দূরে যাইয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হইয়া অল্প একটু দূরেই আমাদের চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল, এই পথটি ছিল প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই ভাবে চলিতে চলিতে প্রায় আট মাইল দূরে একটি বেশ বড় পাহাড়ের কাছে আসিলাম, এই পাহাড়ের নীচে অনেকটা যায়গা জুড়িয়া সমতলক্ষেত্র। এখানে

মোঙ্গোলিয় যাযাবরেরা বৎসরের অনেকটা সময় পশুচারণের জন্য আসিয়া বাস করে। এই জায়গাটির নাম আমথুন্। এই স্থানটীর শোভা অতি চমৎকার। দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে আমথুন অবস্থিত। একটি নদীর নাম নৈচিগোল।

আমরা এখানে আজিকার মত তাঁবু গাড়িলাম। আজ আমাদের দিনটি নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে যে সকল ভারবাহী পশু ছিল তাহার কয়েকটি মারা যাওয়ায় আমাদের বাকী জিনিষপত্র অতি কষ্টে সঙ্গের অল্প সংখ্যক পশুগুলি বহন করিয়া আনিতেছিল। তবুও অর্দ্ধেকের বেশী জিনিষপত্র পশ্চাতে পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব্বের পরিচিত একদল যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা লাশা যাইতেছিল কিন্তু পথে অতিরিক্ত বরফ পড়ার জন্য অগ্রসর হইতে না পারায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

আমরা এখানে এক জাতীয় জ্বালানী কাঠ পাইলাম। এক অদ্ভুত ধরণের কাঁটা গাছ হইতে এই জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়, গাছগুলি ছয় ফিট উচু এবং সারা গা কাঁটায় ঢাকা। ঘাসও প্রচুর পাইয়াছিলাম। আমরা লাশা হইতে এতদিন পর্য্যন্ত উত্তর দিকে চলিয়াছিলাম, এইবার পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিলাম।

২৮শে অক্টোবর। আমরা ১২ মাইল চলিয়া নৈচি নামক স্থানে আসিলাম। এখানে যাযাবরদের দশটি তাঁবু দেখিলাম। জাগরা হইতে নৈচি পর্য্যন্ত সারা দেশটায় কোথাও কোন লোকজনের বসতি নাই। মোঙ্গোলিয়দের তাঁবুর গড়ন একটু বিচিত্র রকমের।

তাঁবগুলির মাঝটা একটা গম্বুজের মত দেখায়, কাঠের কাঠামোর উপর তাঁবুগুলি সাজানো হইয়া থাকে। এই কাঠামো নানা ভাগে বিভক্ত থাকে। তাঁবুর ভিতরে একটি কামরা প্রস্তুত হয়। তাঁবু খুলিয়া ফেলিবার পর সেই কাঠামোর কাঠগুলি যখন সাজানো হয় তখন এক বোঝা লাঠির মত দেখায়। তাঁবুর উপরের দিকে মাঝখানটায় খানিকটা খোলা থাকে, সেই খোলা পথ দিয়া রান্না-বান্নার ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়। তাঁবুর কাপড় এক রকমের কর্কশ পশমী জাতীয়। সেই কাপড়কে খিংজ বা পিংজ বলে। তাঁবুর কাপড় কাঠের কাঠামোর সঙ্গে এমন শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে যে উহা কোনরূপেই খুলিয়া যায় না।

সব তাঁবুতেই বেশী কামরা থাকে না। যাহাদের অবস্থা বেশ ভাল তাহারাই তাঁবুর ভিতরটা কয়েকটা কামরায় ভাগ করিয়া নেয়। তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিবারও মাত্র একটি দরজা বা কপাট। কাঠের তৈয়ারী অর্থাৎ টুকরা টুকরা কাঠের

ফালি দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। মোঙ্গোলীয়রা তাঁবুর ভিতরেই রান্না-বান্না করে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ সব এক সঙ্গে থাকে। মাঝারি রকমের একটি তাঁবু তৈরি করিতে মাত্র বারো টাকা খরচ পড়ে।

নৈচি উপত্যকা

এইবার নৈচি উপত্যকার কথা বলিতেছি। এই স্থানটি ত্যাচিনারি জেলার একটী মহকুমা। এই উপত্যকাটির দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল, চওড়া মাত্র তিন মাইল। চারিদিক বেড়িয়াই ছোট ছোট পাহাড়। কোন পাহাড়ের শৃঙ্গই বরফে ঢাকা নহে। এখানে বরফ পড়িলেও বরফ জমিয়া থাকে না, গলিয়া যায়। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া নৈচি নদী বহিয়া চলিতেছে। এই নদীর শাখা বড় বেশী নাই। অনেক-গুলি উৎস হইতে এবং ঝরণা হইতে ইহার জল আসে। জমি অধিকাংশই সমতল, তবে নদীর প্রবাহের দরুন কোথাও কোথাও অসমতল এবং বন্ধুর। তাহার কারণ নদীর স্রোতের জন্য পাহাড়ের মাটী কাটিয়া ঐরূপ হইয়াছে। এই সুন্দর উপত্যকাটি শ্যামল শস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। নানা প্রকার চাষ-বাস এখানে দেখিলাম। চমরী গোরু, ভেড়া, মোঙ্গোলিও ছাগল,

উট প্রভৃতি অনেকগুলি তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে মনের আনন্দে চরিয়া বেড়াইতেছিল। এখানে আসিলে মনে হয় না যে আমরা তিব্বতের দুর্গম পথের যাত্রী। এই পথে আসিতে আসিতে প্রকৃতির নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ শোভা, সৃষ্টির অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। উপত্যকার পূর্ব্ব দিক দিয়া নৈচি নদী বেশ বিস্তৃতভাবে বহিয়া যাইতেছিল, সেখানে নদীর চওড়া ছিল অত্যন্ত বেশী। এই উপত্যকায় অসভ্য যাযাবরেরা বাস করে। তাহারা সব সময়ই যে এখানে থাকে তাহা নহে, আমরা যখন এখানে আসিয়াছিলাম সে সময়ে এখানে দশটি তাঁবু পড়িয়াছিল। তাঁবুগুলি কি প্রকার সে কথা পূর্ব্বেই বেশ পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক তাঁবুতে ছয়জন করিয়া লোক বাস করিতেছিল।

যাযাবরেরা এই বিস্তৃত উপত্যকার নানা স্থানে বাস করে। ইহারা কখনও বরাবর এক স্থানে তাঁবু গাড়িয়া বাস করে না। যখন যেখানে বেশী পরিমাণ পশুর খাদ্য এবং উর্ব্বর ভূমি দেখিতে পায় সেখানেই ইহারা চলিয়া যায়। এইভাবে এই বিস্তৃত উপত্যকার নানা স্থানে ইহাদের ঘুরিয়া ফিরিয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদের প্রধান খাদ্য হইতেছে দুগ্ধ এবং অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস। ইহারা ভাত ও গম বড় একটা খায় না। সময় সময় প্রায় একশো মাইল দূরবর্ত্তী কোরলুক জেলা হইতে যে গম আমদানী

হয় তাহাই কিছু কিছু খায়। অন্যান্য মোঙ্গোলিয়দের মত ইহারাও বেশ অতিথিবৎসল। আমরা ইহাদের নিকট হইতে বেশ ভাল ব্যবহার পাইয়াছিলাম। এই যাযাবরদের জীবন-যাত্রা অতি সহজ। সকালে উঠিয়া দুগ্ধ দোহন করে। ঘোড়ার দুগ্ধই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। দুধের মধ্যে সামান্য পরিমাণে অম্ল মিশাইয়া ইহারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করে তাহার নাম 'চেকা'।

মোঙ্গোলিয় লোকগুলি বেশ বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত, স্বভাবও নম্র। ইহারা বড় একটা ঝগড়া বিবাদ করিতে চাহে না। বেশ শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই ভালবাসে। ইহাদের বিবাহ ব্যাপারটা অতি চমৎকার। বর কনেকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহের জন্য অনুরোধ উপরোধ করে তারপর মতি স্থির হইলে পর উভয় পক্ষের পিতামাতাই উহাদের বাসের জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করিয়া দেয়। কিছু দিন পরে একটি বড় রকমের ভোজ দিতে হয়, সেই ভোজে আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতীয়েরা আসিয়া মিলিত হয়। নাচ, গান ও আনন্দ উৎসবের পর বিবাহ পাকা হইল বলিয়া সমাজের সকলে মানিয়া নেয়।

এ অঞ্চলে চমরী গোরুর সংখ্যা বড় কম। আমরা নৈচিতে পাঁচ দিন ছিলাম। তারপর রওনা হইলাম। আমাদের সহযাত্রী মোঙ্গোলিয় দল এখানে রহিয়া গেল। তাহারা বরফ পরিষ্কার হইয়া গেলে যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির করিল। এই শিবিরে

অবস্থান কালে যে স্ফুটনাঙ্ক দেখিয়াছিলাম, তাহাতে এখানকার উচ্চতা ১২,০১০ ফিট জানিতে পারিলাম।

পাহাড়ের বুকে মরুভূমি

আমরা এখান হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম এবং কতকগুলি ভারবাহী জন্তু কিনিয়া লইলাম।

৩রা নভেম্বর। আজ পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। প্রায় সাড়ে আট মাইল পথ চলিয়া একটী নদীর তীরে আসিয়া রাত্রির মত তাঁবু ফেলিলাম। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান হইতে প্রায় চারি মাইল এবং ছয় মাইল দূরে তুইটী শাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখা গিয়াছিল।

৪ঠা নভেম্বর। আজ আমরা সাত মাইল পথ চলিয়া নৈচি নদীর কাছে আসিলাম। নৈচি নদীর আর একটী নাম গোল। নদীটি প্রায় চল্লিশ হাত চওড়া হইবে—জল তুই ফিটের বেশী গভীর নয় কিন্তু স্রোতোধারা অত্যন্ত প্রবল। এই নদীর সঙ্গে আর একটী নদী আসিয়া মিলিয়াছে—সেই নদীর বুকে জল অতি অল্প, শুধু বড় বড় শিলার স্তূপ এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে। এখান হইতে আবার যাত্রা সুরু করিলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফাগ্‌লাগা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছানো গেল। চারিদিক

বেড়িয়া পাহাড়—মাঝখানে এই সমতল ভূমি। এখানে অনেক যাযাবরকে দেখিতে পাইলাম। একটী গোলাকার উচ্চ জমির উপরে সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর সম্মুখে লোহার চুল্লিতে আগুন জ্বলিতেছে। এখানে জ্বালানি কাঠ এবং ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমরা পরের দিন নদীর বাম তীর ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। পথের দৃশ্য বেশ সুন্দর—দূরে দূরে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ-সমূহ দেখা যাইতেছিল। তাহাদের অধিকাংশই বরফে ঢাকা। আমরা ৭ই, ৮ই এবং ৯ই নভেম্বর ক্রমাগত কখনও নদীর দক্ষিণ কখনও বা বাম তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে একটী বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে গাছ-পালার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। এই প্রান্তরের ভিতর দিয়াই পথ—একস্থানে দেখিলাম দুইটী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। নদীর ভিতরে জল নাই বলিলেই চলে, বোধ হয় এই জন্যই এখানে গাছপালা কিছুই নাই। দূরে দূরে মাঝে মাঝে পথের পাশে এক প্রকার গাছ দেখিতে পাইলাম। গাছগুলি তিন ফিটের বেশী উঁচু হইবে না, এ অঞ্চলে পশুরা এই গাছের পাতা খাইয়াই কোনরূপে জীবন ধারণ করে।

আমরা এই পথে প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিয়া একটী পাহাড়ের চূড়ায় আসিয়া পড়িলাম। এই পথে খানিকটা

চলিলে পর পথটী ক্রমশঃ সরু হইয়া চলিল, এই পথের দুই দিকে দেওয়ালের মত পাহাড়ের সারি চলিয়াছে--এই পাহাড়ের মধ্যস্থিত গিরিপথ দিয়া চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে যখন পাহাড় ছাড়া খোলা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতাম তখন দেখা যাইত বহুদূর বিস্তৃত মরুভূমি পড়িয়া আছে। এই মরুভূমি উত্তরে এবং পশ্চিমে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে—কোথায় তাহার শেষ তাহা আমরা বলিতে পারিব না। পূর্ব্বদিকেও মরুভূমি রহিয়াছে কিন্তু তাহা তেমন বিস্তৃত নয় বলিয়া মনে হইল। আমরা সন্ধ্যা হইবার একটু আগে নৈচি নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁবু ফেলিলাম। রাত্রিটা এই বিজন মরুদেশের সীমান্তে কাটাইয়া দিব বলিয়াই স্থির করিলাম। আমাদের সঙ্গের পশুগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের খাইবার কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে পথে যে গাছের উল্লেখ করিয়াছি সেই গাছের পাতা কিছু কিছু খাইয়া তাহারা প্রাণ বাঁচাইয়াছিল বটে কিন্তু এখানে সেই গাছেরও অভাব।

হ্রদের দেশে

১০ই নভেম্বর। আজ প্রায় সাড়ে ছয় মাইল পথ চলিয়া আমরা এখানে বিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। প্রান্তরটি আমাদের

একান্ত সৌভাগ্যবশতঃ তৃণরাজি পরিপূর্ণ এবং এ অঞ্চলের স্বাভাবিক ছোট ছোট গাছপালায় ভরা ছিল। সেজন্য পশুদের খাদ্য ও জ্বালানি কাঠের কোনও অভাব হয় নাই। আমরা শুনিলাম এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে মোঙ্গোলীয় যাযাবরেরা বাস করে। জায়গাটির নাম গোলমো। গোলমো ঘন বনে পরিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। সেই বনটী ছয় মাইল প্রশস্ত এবং একশত মাইল দীর্ঘ হইবে। এই বনের গাছগুলিকে মোঙ্গলীয়রা হুম্ম, হার্ম্মো এবং চাক বলে। এই তিন জাতীয় গাছই বনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলি ছয়-সাত ফিটের বেশী উঁচু হয় না। হর্ম্মো গাছে এক প্রকার কালো বা লাল ফল হয়। এই ফল দেখিতে মন্দ নয়, অনেকটা কিস্‌মিস্ বা মনাক্কার মতন গন্ধবিশিষ্ট। নভেম্বর মাসে এই ফল সংগ্রহ করা হয়। খাবার জন্য এবং বাণিজ্য বেসাতি করিবার জন্যই উহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই বনের সর্ব্বত্র খুব লম্বা ঘাসে ঢাকা। গোটা পঞ্চাশেক তাঁবু এই বনভূমিতে পড়িয়াছিল। এখানে আমরা যে মোঙ্গোলীয় যাযাবরদের দেখিলাম তাহারা সকলেই বেশ মোটাসোটা এবং শক্তিশালী। ইহাদের ওষ্ঠ বেশ পুরু এবং গায়ের রঙ পীতাভ। ইহাদের ধন-সম্পদ হইতেছে গৃহপালিত পশু; যেমন—ভেড়া, ছাগল, উট টাট্টু ঘোড়া এবং গোরু। এই ভেড়াগুলি দেখিতে অদ্ভুত রকমের।

ইহাদের লেজ খুব মোটা। এখানে যে গোরুগুলি দেখিলাম তাহারা দেখিতে অনেকটা ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অঞ্চলের গোরুর মতন, তবে ইহাদের গায়ে খুব লম্বা লম্বা লোম আছে। গায়ের রঙ অনেকটা ধূসর। যাযাবরদের প্রধান খাদ্য হইতেছে সিদ্ধ-করা মাংস, দুধ, মাখন ও সাত্তু। কোরলুক নামক স্থান হইতে ইহারা সাত্তু সংগ্রহ করে। মোঙ্গোলীয়দের মধ্যে ইট চায়ের (brick tea) ব্যবহার খুব বেশী। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বর্ষাকালে এখানকার মাটী আর্দ্র থাকে আর লবণের মত এক প্রকার শাদা নির্য্যাস গাছের গোড়ার দিক হইতে বাহির হয়। তাহার ফলে বর্ষাকালে এখানকার গাছপালা মরিয়া যায়। সে-সময়ে নানাপ্রকার পোকাও দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া মশা এত বেশী হয় যে বাস করা ক্লেশকর হইয়া উঠে।

আমরা যে পথ ধরিয়া এইস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম সেই পথটি এখান হইতে পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। নৈচি নদী মরুভূমির ভিতর দিয়া প্রায় চল্লিশ মাইল পথ প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একটী হ্রদের জলে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে। হ্রদটির নাম হারানোর বা দেউলাৎসান হ্রদ। এই হ্রদটির পরিধি প্রায় ষাট মাইল হইবে। এই হ্রদ হইতে কোনও নদী বাহির হয় নাই। এই হ্রদের জল লবণাক্ত। এখান হইতে

প্রায় একশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে হাজির নামক স্থান। তৈচিনার জেলার সর্দ্দার ঝাসা এখানে বাস করেন। হাজিরে বহু লোকের বাস। প্রায় পাঁচশত শিবির আছে এবং এখানকার কোনও কোনও অধিবাসী বেশ ধনী। তাহাদের পাঁচশত টাট্টু, ঘোড়া এবং পাঁচ হাজারের উপর ছাগল এবং ভেড়া আছে। তৈচিনা জেলার বর্ব্বর অধিবাসীরা হাজির হইতে প্রায় ১৫০ শত মাইল পশ্চিমে বাস করে। তাহারা যেখানে বাস করে তাহার অল্প দূরেই এক বিস্তৃত সমতলভূমি, উহার বিস্তার প্রায় ১৫০ মাইল হইবে। কোনও লোকজনের বসতি সেখানে নাই। ঐ বিজন সমতলক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকে খোটান অবস্থিত।

খোটানে তাঁথাস্ নামক এক জাতীয় লোক বাস করে। ইহারা মাথায় শাদা পাগ্ড়ি বাঁধে। তাঁথাস্রা সময়ে সময়ে শিকার করিবার জন্য এই বিস্তীর্ণ সমতলভূমি পার হইয়া যাযাবরদের দেশে আসে। তখন তাহারা যাযাবরদের শিবিরেই বাস করিয়া থাকে। এখানে শোনা গেল প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে সাতজন তাঁথাস্ নিরীহ যাযাবরদের শিবিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল—কিছুদিন থাকিবার পর একদিন রাত্রিকালে তাহারা সেই যাযাবরদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদের গৃহপালিত পশু ইত্যাদি লইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার পর হইতে

মোঙ্গোলীয় যাযাবরেরা এই বিজন প্রান্তরের সীমান্ত প্রদেশে বাস করে না।

মোঙ্গোলীয় স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ অলঙ্কার পরে না বলিলেই চলে। তাহারা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে এইরূপ একপ্রকার পোষাক পরে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই পশ্মী কাপড় ব্যবহার করে। বন্য পশুর লোম এবং চামড়া হইতে ইহারা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। স্ত্রী লোকেরাই সাধারণতঃ স্বামী এবং পুত্র কন্যাদের জন্য কাপড় বুনিয়া থাকে। মোঙ্গোলীয় পুরুষেরা লাশা এবং চীনের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। ইহাদের নমস্কার করিবার রীতি বড় চমৎকার। তাহারা সমপদবীযুক্ত এবং অতিথি—অভ্যাগতদের দেখিতে পাইলে সম্মুখের দিকে দুই হাত বিস্তার করিয়া বলে: 'আমুর ভ্যাইনু'! অর্থাৎ সব ভাল ত? যাযাবরদের অত্যন্ত অতিথিবৎসল দেখিলাম। কোনও বণিক যাত্রীদল উপস্থিত হইতে না হইতেই যাযাবরেরা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে: 'তোমাদের শরীর ভাল তো? নির্ব্বিঘ্নে তোমাদের যাত্রা শেষ হইয়াছে তো?' ইহা ছাড়া তাহারা বণিক যাত্রীদলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের সহিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করে এবং চা, মাখন, দুধ, মাংস এবং চীন দেশ হইতে আনীত একপ্রকার তেলেভাজা পিঠা

দ্বারা অতিথি-সৎকার করে। আমরা গোলমোতে দশ দিন অবস্থান করিলাম। আমার সেক্সটাণ্ট (Sextant) যন্ত্রের একখানি কাচ আলগা হইয়া যাওয়ায় দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল।

২১শে নভেম্বর। আমরা যাযাবরদের শিবির ছাড়িয়া রওনা হইলাম এবং প্রায় সাড়ে সাত মাইল পথ চলিয়া একটী ছোট নদী পার হইলাম। এই পথের দক্ষিণ দিকে দুইটি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ দেখা গেল। উহাদের দূরত্ব প্রায় পনেরো মাইল হইবে। আরও পাঁচ মাইল পথ চলিয়া আমরা হারথুথেল নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে যাযাবরদের প্রায় কুড়িটি শিবির আছে। আমরা একটী প্রাচীন দুর্গও দেখিতে পাইলাম। দুর্গটী বেশ পুরাতন—উহার দেওয়াল কাদামাটীর তৈরি। শোনা গেল যাযাবরেরা এই দুর্গটী বা মাটীর দেওয়াল ঘেরা স্থানটী এক সময়ে শত্রুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

আমরা আজ রাত্রি এখানেই কাটাইলাম। আবার সেই বনের ভিতরের পথ দিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইল। এই পথে প্রচুর ঘাস—আর জ্বালানী কাঠের কোনও অভাবই ছিল না।

২১শে নভেম্বর। আমরা সাড়ে ছয় মাইল পথ চলিয়া থুগ্‌থি নামক স্থানে আসিলাম। এখানেও যাযাবরদের পঞ্চাশটী শিবির

ছিল। এখানের আশেপাশে কোনও নদী বা ঝর্ণা না থাকায় স্থানীয় লোকেরা কূপের জল ব্যবহার করে। কূপগুলি তেমন গভীর নয়—অল্প একটু মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। তুইটী ঘোড়া মারা যাওয়ায় আমাদের এখানে তুইদিন বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল।

আমরা ২৫শে নভেম্বর, দালা নামক স্থানে আসিলাম। এস্থানে চমৎকার প্রস্রবণের জল পাওয়া গেল। এখান হইতে আরও দশ মাইল পথ চলিয়া চুগু নামক স্থানে আসিলাম। এখানে একটী নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদীটি উত্তরে মরুভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়া আপনার স্রোতোধারা মরুভূমির বুকে মিলাইয়া দিয়াছে। চুগুতে রাত্রিটা কাটানো গেল। পরদিন আবার যাত্রা সুরু হইল—পথে কোনও প্রস্রবণ বা নদী দেখিতে পাইলাম না। অনেক দূরে কতকগুলি শিবির দেখা গেল—ঐগুলি বর্ব্বর যাযাবরদের বলিয়া অনুমান করিলাম। ইহারা নদী বা প্রস্রবণের আশে-পাশে ছাড়া কোথাও শিবির স্থাপন করে না। পরের দিন প্রায় বারো মাইল পথ চলিয়া আমরা ধানাহোথো নামক একটী স্থানে আসিলাম। এখানে যাযাবরদের বাস করিবার মাত্র তুইটী শিবির দেখা গেল।

২৭শে নভেম্বর। আমরা প্রায় চার মাইল পথ চলিবার পর একটী নদী পার হইলাম। নদীটী দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছে।

আরও কিছু দূর যাইবার পরে কতকগুলি ঝর্ণা পাইলাম। এই ঝর্ণা গুলির জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি সুপেয়। এই পথে আরও প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পথ চলিবার পর আর একটী নদী পড়িল—এই নদীটি উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে। নদীর জল লবণাক্ত এবং নদীর পারে খণ্ড খণ্ড অনেক লবণের চাপ দেখিতে পাইলাম। এইরূপ লবণ এ-দেশের লোকেরা ব্যবহার করে। আমি এ-স্থানের আশে-পাশে কোনও লবণের পাহাড় বা খনির কথা শুনি নাই। আরও সওয়া তিন মাইল পথ চলিয়া আমরা তেনগিলিক নামক একটী স্থানে আসিলাম। এই স্থানটী দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। একটী নদীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—সেই নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে। অপর নদীটীর নাম বলিতে পারিলাম না। এই জায়গাটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। দশটি কাঁচা বাড়ী এবং একশতটী তাঁবু দেখিতে পাইলাম। এখানে শস্যক্ষেত্রও আছে। প্রতি বৎসর বার্লির চাষ হয়। এখানকার উচ্চতা সাত হাজার সাত শত কুড়ি ফিট হইবে। বাইগোল নদী পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া তেনগিলিক্ নামক সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে চলিয়া আসিতেছে। তারপরে উহা মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নৈচিতে যে মোঙ্গোলীয় যাত্রীদল আমাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছিল এখানে

তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম। এই বণিকদল এ-অঞ্চলের অধিবাসী। অম্লদূরেই ইহাদের বাড়ী, কাজেই ইহারা আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। কেবল মাত্র দুইজন তিব্বতীয় আমাদের কাছে রহিল। আমরা কয়েকদিন এইস্থানে থাকিব বলিয়া স্থির করিলাম কেননা সঙ্গের পশুগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর আমাদের রসদের মধ্যে সাত্তু একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। আমরা মোঙ্গোলিয়ায় কোন জল-যন্ত্র দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু ছোট ছোট হস্তচালিত যন্ত্র দেখিতে পাইলাম। সেগুলি হোইহুথার নামক স্থান হইতে আনীত হাল্কা রকমের লাল পাথরের দ্বারা তৈরি।

আমাদের এখানে আসিবার দুই দিন পরে কয়েকজন পরিচিত কাফিলা বন্ধু আমাদিগকে বলিলেন যে এখান হইতে এক দুপুরের পথ দূরে দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলিতে বেশ ভাল শিকার মিলে। অনেক রকমের বন্য পশু পাওয়া যায়। তাহাদের মাংস খাইতেও যেমন সুস্বাদু তেমনই তাহাদের গায়ের চামড়াও অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা চার পাঁচ দিন দল বাঁধিয়া বেশ মনের আনন্দে শিকার করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে শিকারও বেশ ভাল মিলিয়াছিল। কয়েকটী চমরী গোরু এবং বন্য গাধা আমরা শিকার করিয়াছিলাম। শিকারে বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম।

দস্যুর কবলে

আমরা পাঁচদিন পর শিকার হইতে ফিরিলাম এবং স্থির করিলাম পরের দিন সকাল বেলা অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর প্রাতে এই স্থান পরিত্যাগ করিব। পরের দিন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময়ে চিয়ামো-গোলোক জাতীয় প্রায় দুই শত অশ্বারোহী দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমরা এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা করি নাই, কাজেই কি যে করিব সহসা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি উহাদের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য স্থানীয় লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রস্তুত হইলাম।

প্রথমতঃ দূর হইতে উভয় পক্ষেই বন্দুক ছোড়াছুড়ি হইল কিন্তু দস্যুদল তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অতি দ্রুত বর্শা ও তরবারি লইয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের গুলিতে দস্যুদলের একজন নিহত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা সেদিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত বেপরোয়া-ভাবে আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। আমাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে হাতাহাতি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি। তারপর লোকসংখ্যায়ও অত্যন্ত অল্প ছিলাম। সুতরাং প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমরা জিনিষ-পত্র সব ফেলিয়া পলায়ন করিলাম।

দস্যুদল আসিয়া আমাদের তাঁবুগুলি আক্রমণ করিল। জিনিষ-পত্র সব ছিন্ন ভিন্ন এবং লুঠ-পাট করিয়া লইয়া গেল। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ইহারা আত্মসাৎ করিয়াছিল। দস্যুরা এইভাবে লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবার পর স্থানীয় অধিবাসীরা এবং অদূরবর্ত্তী শিবিরের সব যাযাবরেরা আসিয়া আমাদের সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইল। দস্যুরা যে পথে গিয়াছিল আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ অনুসন্ধান চলিল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। পরের দিন আমাদের অনুসরণের ফলে কিছু সুফল হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশটী ঘোড়া ফিরিয়া পাওয়া গেল। তাহাদের অধিকাংশই ছিল খোঁড়া এবং কাজের অনুপযুক্ত। দস্যুরা ঐসব অক্ষম কাজের অনুপযুক্ত ঘোড়াগুলি লইয়া যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়াই বোধ হয় পথে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এখান হইতে যাত্রীদল সব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মোঙ্গোলীয়রা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিব্বতীয়দের মধ্যে কেহ কেহ আর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে না করিয়া লাশার দিকে ফিরিয়া গেল। কেহ কেহ তেঙ্গেলিকেই রহিয়া গেল। আমরা এখানে আমাদের তিব্বতীয় ভৃত্যদের বিদায় দিলাম কারণ তাহাদের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার নূতন পথে যাত্রার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মোঙ্গোলীয়দের দেশে

১৩ই ডিসেম্বর। নানা গোলমালের ভিতর দিয়া এ কয়দিন কাটিয়া গেল। তিনটি বলদ ভাড়া করিয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তেঙ্গেলিকের কয়েকজন বন্ধু পথে যাহাতে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য কিছু মাংস, মাখন এবং খাদ্যদ্রব্যাদি দিলেন—এমন কি জিনিষপত্রাদি বাঁধিয়া লইবার জন্য চামড়ার দড়িও দিয়াছিলেন। এইবার বেশ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যাত্রা সুরু করা গেল। প্রায় ছয় মাইল পথ চলিয়া হাড়োরি নামক একটি জায়গায় আসিলাম। এখানে যাযাবরদের বারোটি শিবির ছিল। আমরা এখানে একদিন থাকিতে বাধ্য হইলাম, কারণ কথা ছিল যে বলদগুলির মালিকেরা এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত তাহারা আসিয়া পৌঁছিল না।

১৫ই ডিসেম্বর। আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে কয়েক মাইল যাইবার পর দেখা গেল দূরে একটা পাহাড়ের নীচে মোঙ্গোলীয়রা কাঁচা দেওয়াল দিয়া অনেকটা জায়গা ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এখান হইতে প্রায় তিন চার মাইল দূরে চারিটি গিরিশৃঙ্গ নজরে পড়িল। এই শৃঙ্গগুলির চূড়ায় শাদা বরফ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় তেরো মাইল পথ চলিয়া দেবাসুখা নামক একটি জায়গায় আসিয়া রাত্রি কাটাইলাম।

এখানে চারিটি যাযাবর পরিবার তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল ; আমরা যে পথে আসিতেছিলাম সেই পথ বালুকাকীর্ণ ছিল।

সোণার পাখী

১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই তারিখ এ কয়দিন আমাদের বাইগোল নদীর তীর ধরিয়া চলিতে হইয়াছিল। নদীর জল কোথাও দুই ফিটের বেশী গভীর নয়। এই নদী দশ হাতের বেশী প্রশস্ত হইবে না। শোনা গেল বাইগোল নদী ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম দিকে বহিয়া যাইয়া অবশেষে কোন্ অজানা মরুভূমির বুকে মিলাইয়া গিয়াছে। আমাদের কাছে কিন্তু এবারকার পথটি বেশ ভালই লাগিয়াছিল, কেননা—এইবার পথের দুইদিকে ছিল বন-জঙ্গল। আর ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক দেখিয়াছিলাম অসংখ্য। আমি একটি পাখীর কথা বলিতেছি সেই পাখীর মত পাখী তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়ার পথে আর কখনও দেখি নাই। এই পাখীটি 'স্বর্ণ-জীবঞ্জিব' (Golden Pheasant) পাখীর মত। এই পথে বনের ধারে আমি কিন্তু বহু সংখ্যক এই জাতীয় পাখী দেখিয়াছিলাম।

আমরা এই সুন্দর বনপ্রদেশে দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। চারিদিকের দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনই এ-স্থানের নীরবতাও আমাদিগকে পুলকিত করিয়াছিল।

কোনও হিংস্র জন্তুর ভয় এখানে ছিল না কাজেই সবুজ ঘাসের বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গোরুগুলি মনের সুখে চরিয়া বেড়াইতেছিল।

আমরা ১৮ই তারিখে এইস্থান ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিলাম। পথের মধ্যে অনেক নদী পড়িল। এইসব নদী আমাদের পার হইতে হইয়াছিল। নদীর জল লোণা—কোন নদীই তেমন গভীর নহে। কোথাও দুই তিনটি নদী আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে কিন্তু একটির জলও সুমিষ্ট নহে। এইজন্য যাযাবরেরা বড় একটা এখানে আসিয়া বাস করে না। কেননা যোজনের পর যোজন পথ চলিলেও পানীয় জল পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

শীতকালের কথা বলিতেছি। শীতের সময় যখন বরফে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে সে সময়ে বরফের নীচ হইতে যা কিছু সামান্য সুমিষ্ট জল পাওয়া যায় তাহাই হয় শীতের দিনের এই পথের যাত্রীদের একমাত্র পানীয় সম্বল। এখানকার নদী-গুলিও ক্রমাগত পশ্চিম দিকে বহিয়া চলিয়া অবশেষে মোঙ্গো-লিয়ার দিকে কোন্ এক অজ্ঞাত মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে আপনাদের স্রোতোধারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা এই পথে চলিতে চলিতে একটি ছোট নদী পার হইয়া এক অনুচ্চ গিরিবর্ত্মে আসিয়া পৌঁছিলাম।

হ্রদের তীরে

গিরিপথ পার হইয়া প্রায় দুই মাইল দূরে একটি সমতল ভূমিতে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিলাম। এখানে কোনও ঘাস বা মিষ্ট জল পাওয়া গেল না, কিন্তু জ্বালানী কাঠের গাছ ছিল প্রচুর। এই জায়গাটির নাম তাইচিনার। এখানে দেখিলাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে একটি গিরিশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর গোড়ার দিকটা বালুকাময় আর এই পর্ব্বত-শ্রেণীর একটা বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যদিকের শৃঙ্গগুলি বেশ উচু। এই গিরিশ্রেণীর একদিকে তাইচিনার জেলা এবং অন্য দিকে কোরলুক জেলা।

১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর। আমরা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ মাইল পথ চলিয়া চাকাননামাগা নামক স্থানে আসিলাম। এইখানে একটি হ্রদের দক্ষিণ তীরে আমরা তাঁবু ফেলিলাম। এই হ্রদটির নাম থোস্নোর বা টোস্নুন। হ্রদটির দৈর্ঘ্য বারো মাইল এবং প্রস্থ হইবে প্রায় আট মাইল। এই হ্রদের জল লবণাক্ত এবং গন্ধকে পরিপূর্ণ। আমাদের তাঁবুর কাছে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ ছিল—উহার জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া হ্রদের জলের সহিত গিয়া মিশিয়াছে। আমাদের পানের এবং রন্ধনের জন্য হ্রদের উপরিভাগে যে বরফ ছিল তাহা হইতে জল সংগ্রহ করিতাম। আমরা যে স্থানে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম সেখান হইতে চারিদিকে চারিটি পথ চলিয়া গিয়াছে।

একটি তাইচিনারের দিকে অন্যটি জুন জেলার দিকে, আর দুইটি হ্রদের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম তীর দিয়া হোয়ত্থারা এবং গোবির দিকে চলিয়া গিয়াছে। অপরটি গিয়াছে কোর্লুক জেলার অভিমুখে। কোর্লুক জেলা যাযাবরদের কাছে বিশেষ প্রিয়। কেননা এই জেলাই হইতেছে তাহাদের খাদ্যভাণ্ডার। আমাদের তাঁবুর চারিদিকে জ্বালানী কাঠের গাছ ছিল প্রচুর—গাছগুলি দেখিতে আকারে ছোট। মাঠে কিন্তু তৃণ একেবারেই ছিল না। আমরা এখানে এক রাত্রি ছিলাম। এখানকার পথ বেশ ভাল কিন্তু বর্ষার সময়ে বৃষ্টির দরুন সবটা পথ কাদায় ঢাকিয়া ফেলে। বিশেষতঃ যে নদীগুলির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই নদীগুলির লবণাক্ত জল একেবারে তীর ছাপাইয়া পথ-ঘাটের উপর আসিয়া পড়ে।

আমরা কোরলুক্ হ্রদের তীরে আসিলাম। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে দশ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় চার মাইল হইবে। গোবির কাছে অনেক যাযাবরদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সংখ্যা একশতের কম হইবে না। আমরা একদিন গোবির দিকে যাইবার পথে একজন তিব্বতীয়ের দেখা পাইলাম। সে লোকটি ঐস্থানে একা বাস করিতেছিল, কাজেই আমাদিগকে পাইয়া তাহার খুব আনন্দ হইল। এই লোকটির বাড়ী ছিল গোঁয়েংসি। সে কোরলুক্ অঞ্চলে বিবাহ করিয়া এখানকারই স্থায়ী অধিবাসী

হইয়া গিয়াছে। সে আমাদিগকে বলিল যে গ্রীষ্মকাল আসার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত আমাদের এখানে থাকাই ভাল, তাহা হইলে সে সেই সময়ে আমাদের সঙ্গী হইতে পারে ও যাত্রার পক্ষে নানাভাবে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে। আমরা এখানে প্রায় তিন মাস ছিলাম।

হ্রদের বুকে দ্বীপ

গোবির দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে গোল্‌মো নামক একটি ছোট গ্রামে কতকগুলি মোঙ্গোলিয় যাযাবর বাস করিতেছিল। আমাদের সহিত ইহাদের অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গেল। যাযাবরেরা আমাদের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল।

এখানে একটী বেশ বড় হ্রদ আছে উহা সু-ওনবো বা নীল হ্রদ নামে পরিচিত। সুন্দর হ্রদটি! ইহার বুকের নীল জলে ছোট ছোট ঢেউগুলি সূর্য্য কিরণে হীরার মত জ্বলিতেছিল। হ্রদটি খুব বড়, ইহার পরিধি প্রায় ২৮০ মাইল হইবে। স্থানীয় লোকেরা হ্রদের নাম দিয়াছে সোনিং * অর্থাৎ হ্রদের হৃদয়। এই হ্রদের মধ্যে একটি বেশ বড় দ্বীপ আছে। দ্বীপটি দেখিতে চমৎকার।

* The lake is about 280 miles in circumference—Record of survey of India volume III, page 2547.

এই দ্বীপের মধ্যে একটি গোম্ফা আছে। সেই গোম্ফার মধ্যে প্রায় কুড়িজন সন্ন্যাসী বাস করেন। ঐ দ্বীপের ভিতর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে সেখানে সুমিষ্ট জলের একটি প্রস্রবণ রহিয়াছে। সেজন্য আশ্রমবাসীদের পানীয় জলের কোনও অসুবিধা হয় না। এই আশ্রমের অধিবাসীরা শীতের চারি মাস বাহির হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনেন। সে সময়ে হ্রদের জল একেবারে বরফে পরিণত হয় সেজন্যই তাঁহারা তীরে যাতায়াত করিতে পারেন। এই হ্রদে প্রচুর মাছ আছে, সেই মাছ ধরিয়া মোঙ্গোলিয় জেলেরা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিক্রয় করে। হ্রদের পারে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। বণিকেরা এখান হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া দেশ-বিদেশে বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করে। হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে কুকুমবাম নামে আর একটি বৃহৎ গোম্ফা আছে। সেই গোম্ফার কাছাকাছি একস্থানে প্রায় তিন হাজার মঠ আছে।

দস্যু-ডাকাতের দেশ

মোঙ্গোলিয় বৌদ্ধদের নিকট এই স্থান একটি পবিত্র তীর্থস্থান রূপে পরিচিত। বৌদ্ধদের কাছে এই হ্রদটি এতদূর পবিত্র যে মোঙ্গোলিয়রা এই হ্রদের চারি পার প্রদক্ষিণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। হ্রদের দক্ষিণ তীরে বহু

চোর-ডাকাতের বাস। যাত্রিগণ ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া অনেক সময় দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাইয়া থাকে। এই হ্রদের তীর হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে টাঙ্কার বা ডোঙ্কির নামে একটি স্থান ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। হ্রদের আরও পূর্ব্বদিকে আলাসা নামক একটি স্থানে কার্পেট বা গালিচা বুনান হয়। কার্পেটের জন্য ঐ স্থানটি বিখ্যাত। চীন-সম্রাটের এক জামাতা এই অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা।

মোঙ্গোলিয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং লাশা সহরকে তাহারা তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুণ্যপীঠ এবং বিদ্যাকেন্দ্র বলিয়া মনে করে। লাশার তিনটি গোম্ফার প্রধান লামা তিনজন বিদ্যার্থীকে গিসী (Learned) বা পণ্ডিত উপাধি দিয়া থাকেন। সেই তিনটী গোম্ফার নাম হইতেছে সেরন্-রা, রেণ্-ফুং এবং গ্যাদেন্। গিসী বা পণ্ডিত উপাধি লইতে ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। ক্রমাগত বারো বৎসর কাল বিশেষ মনোযোগ-সহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে কেহই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সে সময়ে ছাত্রদের বৌদ্ধদর্শন এবং বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর উত্তীর্ণ ছাত্রদের কয়েকটী অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। একটি হইতেছে গোম্ফার শ্রমণদিগকে বা সন্ন্যাসীদিগকে ভোজ দেওয়া। এই ভোজের পর প্রত্যেক

গোম্ফায় সংবাদ পাঠান হয়, তদনুযায়ী 'গিসী' উপাধিধারী শ্রমণেরা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। 'গিসী' উপাধিধারী লামারা তিব্বতে এবং মোঙ্গোলিয়াতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিবাহ করিতে পারেন না।

এ-অঞ্চলের মোঙ্গোলিয়েরা ট্যান্‌জেন্ গোম্ব নামে একজন বীর-পুরুষের কাহিনী বলিয়া অতিশয় গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইনি দেশের শত্রু সিলিং এবং আলাসার অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া চীনের সম্রাট পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বংশধরেরা নাকি এখনও চীনদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা এই স্থান হইতে ক্রমাগত চলিতে চলিতে অবশেষে ২রা এপ্রিল তারিখ ওবো নামক স্থানে আসিলাম। এখানে মোঙ্গোলিয়েরা মাটির ঢিপি তৈরি করিয়া তাহার উপর কয়েকটা নিশান পুতিয়া রাখিয়াছে, ঐ স্থানে তাহারা পূজা করে। এখান হইতে প্রায় সাড়ে তের মাইল দূরে সিরথ্যাং নামক স্থানে আসিলাম। সিরথ্যাং একটি তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত সমতল ভূমি। উহার চারিদিক ঘিরিয়া বালির স্তূপ। এই সমতল ভূমিটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল এবং প্রস্থে সতেরো মাইল হইবে। এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি সুমিষ্ট পানীয় জলের প্রস্রবণ থাকায় জলের কোনও অভাব হয় না। এখানে কয়েকটি ছোট ছোট লোণা জলে ভরা পুকুর

থাকায় অধিবাসীদের লবণের জন্য ভাবিতে হয় না। দুইটি হ্রদও এখানে দেখিলাম, একটি উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আর একটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। দুইটির আকারই একরূপ। চার মাইল দৈর্ঘ্য এবং আড়াই মাইল প্রস্থ। হ্রদ দুইটিতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য আছে। এখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রায় তিনশতটি তাঁবু রহিয়াছে। শীতের সময় উহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। তখন পঞ্চাশটির বেশী তাঁবু এখানে থাকে না। শীতকালে এখানকার লোকেরা ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য উপত্যকায় গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই উপত্যকাটি উর্ব্বর এবং শ্যামল-তরুলতা-গুল্ম পরিশোভিত বলিয়া খাওয়া দাওয়ার এবং পশুদের তৃণ পাইবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না।

বন্যজাতির দেশ

সিরথ্যাংয়ের উত্তর দিকে যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে অনেক বন্যজাতি বাস করে। তাহাদের গায়ের রং কাল, শরীর সুগঠিত এবং তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় না যে তাহাদের খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে কোনরূপ অসুবিধা আছে। এই বন্যজাতীয় লোকেরা কাপড় পরে না। পশুর চামড়া পরে। ইহারা ঘরে কিংবা তাঁবুতে বাস করে না। পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের নীচে অথবা বড় বড় শিলাস্তূপের আড়ালে বাস

করে। ইহারা এতদূর অসভ্য ও বর্ব্বর যে শিকার করিবার মত অস্ত্রশস্ত্রও ইহাদের নাই। এই বুনোরা ঝরণার ধারে শিকার করিবার জন্য মাটিতে শুইয়া গোপনে আড়ি পাতিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে শিকারের অপেক্ষা করে এবং যখন কোন শিকার দেখিতে পায় তখন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মারিয়া ফেলে। বুনোরা না খায় এমন জন্তু নাই। এমন কি ইন্দুর, টিক্‌টিকি, গিরগিটি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর মাংস খাইতেও ইহারা দ্বিধা করে না।

এই বুনোরা এত দ্রুত চলিতে পারে যে একজন ঘোড়-সোয়ার অতি দ্রুত ঘোড়া চালাইয়াও উহাদিগকে ধরিতে পারে না। ইহারা কোনও সভ্য লোককে দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া যায়। এই বর্ব্বর লোকেরা চকমকির সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে এবং তাহারা যে সকল পশু-পক্ষী মারে তাহা-দিগকে অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া লইয়া খাইয়া ফেলে। ইহারা সময় সময় পাথরের অগ্রভাগ ছুঁচালো করিয়া তাহা দিয়া বন্যপশু শিকার করে। সময় সময় ইহারা গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি চুরি করিয়া লইয়া যায় তবে সে খুব বেশী করে না।

এই অঞ্চলে শ্যামোয় চমরি গোরু, নেক্‌ড়ে বাঘ, খরগোশ, ধূসর ভালুক, ব্যাকট্রিয়া দেশীয় উট এবং ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু বন্য অবস্থায় বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে

এখানকার লোকেরা একটি মজার গল্প বলে। একবার মোঙ্গোলিয় সৈন্যেরা লাশার রাজসরকারকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহী রাজাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য যাইবার সময় এই পথে তাহাদের কতকগুলি উট ও ঘোড়া ছাড়া পড়িয়াছিল। এই সব বন্য উট ও ঘোড়া সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীয় উট ও ঘোড়ার বংশধর। এমন কি এ স্থানের মোঙ্গোলীয় অধিবাসীরাও আপনাদিগকে সেই সব সৈন্যদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করে। এ-স্থানের বন্যপশু শিকার করিবার জন্য অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন কেন-না ঐ সব জন্তুর চামড়া এবং মাংস দুই-ই কাজে লাগে। ঘোড়া শিকার বড় একটা হয় না ইহার কারণ এই যে ঘোড়ার মাংস কিংবা চামড়া শিকারীদের কাজে লাগে না।

মোঙ্গোলিয়ার এই অঞ্চলে বৎসরে তিন বারের বেশী বৃষ্টি হয় না। এদেশের আকাশের গায়ে বজ্র ও বিদ্যুতের খেলা দেখিতে পাওয়া যায় না। বরফও বেশী পড়ে না।

বিপদ-বরণ

এ অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত অনবরত, প্রায় প্রতিদিনই ধূলির ঝড় বহিয়া থাকে ; সে সময়ে এই প্রদেশে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা এখান হইতে জেম্বি আসিলাম। জেম্বিতে প্রায় তিন মাস ছিলাম। এখানে মাটির

দেওয়াল ঘেরা একটি বাড়ীর মধ্যে লামা বাস করেন। লামাকে এস্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সকলেই তাঁহার উপদেশ মত চলাফেরা করে। যদিও এখানকার লোকেরা চাষবাস করে না তবু তাহাদের অবস্থা মোটের উপর ভাল। সকলেই কিছু না কিছু ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ছাগল, ভেড়া, গোরু, ঘোড়া, উট এবং ভেড়ার লোমের বিনিময়ে তাহারা সাইতু, নাইচি এবং নাহুলি প্রভৃতি স্থান হইতে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। ইহাদের বাসন বা আসবাবপত্র চীনদেশ হইতে আসে। অন্যান্য মোঙ্গোলিয়দের মত ইহাদের খাদ্য একই প্রকারের। এখানকার স্ত্রী-পুরুষের পোষাকও প্রায় এক ধরণের। লম্বা পাজামা, আর গায়ের জামা আমাদের দেশের চোগার মত দেখিতে। এইসব গায়ের জামা ও পরিবার পাজামা প্রভৃতি চামড়া ও পশম দিয়া তৈরি হয়। আমরা ইহাদের নিকট বেশ ভাল ব্যবহারই পাইয়াছি। এখানকার লামার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহাকে 'খাতক' নামক বস্ত্র উপহার দিতে হয়।

আমাদের সঙ্গে যে সামান্য পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ছিল তাহা অতি সহজেই এখানে বিক্রী হইয়া গেল। আমাদের সঙ্গী গঙ্গারাম এখান হইতে আমাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। সে শুনিয়াছিল চীনের সম্রাটের সঙ্গে হুহুদের অর্থাৎ চীনের মুসলমানদের যুদ্ধ

বাঁধিয়াছে। গঙ্গারাম বলিল সে এ অঞ্চলেই কয়েক বৎসর থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গী চ্যাম্বলকেও আমার সহিত যাহাতে সে না যায় সে জন্য তাহাকে নানাভাবে কু-পরামর্শ দিতেছিল। এমন কি আমিও যাহাতে না যাই সে-বিষয়ে তাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। একদিন আমি আমার শিবিরে আসিয়া দেখিলাম চ্যাম্বেল অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানিলাম, গঙ্গারাম তাহাকে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছে। ঐ সুযোগে গঙ্গারাম দুইটি ঘোড়া, তিনটি ছোট তাঁবু, একটি ছোট দূরবীণ এবং প্রায় দেড়শত টাকা মূল্যের রৌপ্য দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পরের দিন আমি তাঁবুতে আসিয়া চ্যাম্বেলকে দেখিতে পাইলাম, সে সত্য সত্যই হারাণ ছাগলগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদের একজন বন্ধু এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন যে তিনি লামাকে বলিয়া গঙ্গারামকে ধরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। এ-সময়ে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের নিকট পঞ্চাশ টাকার অধিক মূল্যের জিনিষ পত্র কিছুই ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ একদল বণিক লামাকে দেখিবার জন্য এখানে আসেন। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম গঙ্গারামের সহিত পথে তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল, সে এই যাত্রীদলের নিকট বলিয়াছে যে ঘোড়া দুইটি বিক্রয় করিয়া মাস তিনেক পরে সে আবার ফিরিয়া আসিবে। আমরা একান্ত

নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া পড়িলাম। আর যে তাহাদের সহিত দেখা হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা রহিল না। কি করিব নিরুপায় হইয়া এখানে আমরা পাঁচ মাস ছাগল ও ঘোড়া চরাইতাম। কিন্তু এ-কাজ ভাল লাগিতেছিল না। শেষটায় স্থির করিলাম, যে সামান্য সম্বল আছে তাহা দ্বারা যতদিন চলিবে চলুক পরে না হয় ভিক্ষা করিয়া পথ চলিব।

৩রা জানুয়ারী (১৮৮১ খ্রীঃ অঃ)। এখানকার কয়েকজন লোক ছাগল এবং ভেড়া প্রভৃতির বিনিময়ে খাদ্য-শস্য-সংগ্রহ করিবার জন্য সাইতু যাইতেছিল। আমরাও আমাদের মনিবের অনুমতি লইয়া তাহাদের সঙ্গী হইলাম। মনিবটি অত্যন্ত ভদ্রলোক। তিনি প্রায় চল্লিশ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়া দিলেন এবং পথে যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয় সে জন্য প্রচুর গরম কাপড় এবং খাদ্যের সংস্থান করিয়া দিলেন।

আমরা প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ চলিয়া একটি ছোট নদী পার হইলাম। পূর্ব্বে যে দুইটি হ্রদের কথা বলিয়াছি এই নদীটি সেই হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা এখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটি তুষারাবৃত পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে পাইলাম, এই পর্ব্বত-শ্রেণীর নাম অমন-দা-পারো। সিরথ্যাংএর লোকেরা মনে করে এই স্থানে তাহাদের রক্ষক-দেবতা শিবডাগ্ বাস করেন।

আমরা এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে অনেক নদী এবং গিরিপথ উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ৮ই জানুয়ারী সাইতুতে আসিয়া পৌঁছিলাম। মোঙ্গোলিয়েরা এই স্থানকে সাচু বলে। নদীর দক্ষিণ পারে সাইতু অবস্থিত। সাইতু সহরটি বেশ বড়। উহার পরিধি প্রায় ছয় মাইল হইবে। বিশেষ যত্ন করিয়া যে সহরটি তৈরি তাহা নহে, সহরের বাহিরটা রৌদ্রে শুকানো ইট দিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। এখানকার পানীয় জল এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য জল নদী হইতেই লোকে সংগ্রহ করে। সাইতুর বাজারটি বেশ বড়। বাজারের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা রহিয়াছে। রাস্তার দুইদিকে বাড়ী ঘর। বাড়ীগুলির ছাদ, দেওয়াল সবই রৌদ্রে শুকান ইট দিয়া প্রস্তুত। কোন কোন বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর আছে, সেই সব ঘরে বণিকেরা এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্থানে চাকর-বাকরদের থাকিবার স্বতন্ত্র ঘর আছে। সাইতুর বাজার, সহর এবং দুর্গের সমুদয় বাড়ীঘর লইয়া এখানকার বাড়ীর সংখ্যা ২০০০ এরূপ হইবে।

সাইতুর লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তিব্বতে যেমন ধর্ম্মের গোঁড়ামি আছে এখানে সেইরূপ কোন গোঁড়ামি নাই। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ নাই।

এখানে একটি ভেড়ার বদলে ভারতীয় মুদ্রা ১।০ পাঁচসিকা পাওয়া যায়। এ স্থানে মসুর, মটর প্রভৃতি ডালের চাষ হয়।

চাউল এখানে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। ইয়ারকন্দ হইতে এখানে চাউল বিক্রয়ের জন্য আসে। সাইতুতে অল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জি এবং ফলমূল পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে আপেল, নাস্‌পাতি, শসা, তরমুজ, পেয়ারা, মালবেরি, বাদাম, মূলা, আলুবখ্‌ড়া, তুঁত, আখ্‌রোট, গাজর, শালগম, সরিষা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মিলে। এদেশে আখের চাষ হয় না। তবে উত্তর দেশ হইতে এক প্রকার খাদ্য আসে যাহা মধু-পিষ্টক নামে অভিহিত হয়। এখানে এক প্রকার কার্পাসের চাষ হয় তাহার তূলা হইতে যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা দিয়া মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি চীন সম্রাটের একজন কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া রেশমের বা পশমী কাপড় প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখানকার খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য হইতেছে রুটি, তরকারি, শাক ভাজা, মাংস এবং দুধ। ভেড়া, এবং মুর্‌গী প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই লোকে পালে। কেন-না এদেশের লোকের কাছে মুরগীর মাংস ও ভেড়ার মাংস বিশেষ প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাইতুর জলবায়ু বেশ ভাল কতকটা ইয়ারকন্দের মত। এখানকার লোকেরা মোঙ্গোলিয়দের মত মোটা কিম্বা বলিষ্ঠ নহে। এখানকার পুরুষ ও মেয়েরা নীল, কাল এবং শাদা রংয়ের পোষাক পরে। শোক-প্রকাশের জন্য শাদা পোষাক ব্যবহৃত

হয়। শীতের সময় কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তুলায় ভর্ত্তি জামা পরে। স্ত্রীলোকেরা মাথার চুল উল্টাইয়া বাঁধিয়া পেছনের দিকে ঝুলাইয়া দেয়। মেয়েরা সাধারণতঃ পা-জামার মত পোষাক পরে। এদেশের মেয়েদের পা খুব ছোট, কাহারও ছয় ইঞ্চির বেশী লম্বা পা দেখা যায় না। মেয়েদের বয়স যখন তিন বৎসর হয় তখন তাহাদের গলায় এক সের ওজনের একটা লৌহ শিকল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে পা এমন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেয় যে পায়ে ঘা হয়। এজন্যই উহাদের পা স্বাভাবিক আকার ধারণ করে না। পায়ে প্রায়ই ঘা থাকে। এ-দেশের স্ত্রীলোকেরা এজন্য পুরুষের কাছে কখনও পা বাহির করে না।

আমরা এখানে প্রায় দশ দিন থাকিয়া যেদিন এখান হইতে রওনা হইলাম সেদিনই সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে একটা বিপদ ঘটিল। ১৮৮১ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারী। আজ আমরা থোর-কোথ নামক স্থানের দিকে কয়েকজন বণিকের সঙ্গে রওনা হইয়া কেবল কয়েক মাইল পথ আসিয়াছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী আমাদিগকে সাইতুর শাসনকর্ত্তার নিকট ফিরাইয়া নিল।

শাসনকর্ত্তা আমাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, আমরা কে? কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কি প্রয়োজন? তিনি আমাদিগকে চোর কিম্বা বিদেশী গোয়েন্দা মনে করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের

প্রতি এই আদেশ দিলেন যে আমরা যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিব ততদিন আমাদিগকে ঐখানে বন্দী থাকিতে হইবে। তিনি আমাদিগকে স্থানীয় একজন ধনী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

এ-দেশে ঘোড়া ক্রয় করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া আমরা আমাদের সঙ্গীয় ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিয়া দিলাম। কেন-না কতদিন পর্য্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে সে-বিষয়ে ত কিছুই জানিতাম না। আমরা এখানে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ফল বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। এদেশে একপ্রকার অদ্ভুত পীড়া দেখিলাম। তাহার নাম "বাম্"। এই ব্যারামে পায়ে এক প্রকার লাল লাল চাকা চাকা দাগ হয়। ইহার বেদনা এত দূর যন্ত্রণাদায়ক হয় যে কেহ এইরোগে আক্রান্ত হইলে সে আর দাঁড়াইতেও পারে না, পথ-চলা ত দূরের কথা। আমি এই ব্যারামে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা বলিয়া বোঝান কষ্টকর। রোগের প্রথম হইতে ইহার চিকিৎসা না করিলে পা দু'খানি চিরদিনের মত অচল হইয়া পড়ে। আমি মূলার রস ব্যবহার করিয়া বেশ ভাল ফল পাইয়াছিলাম। প্রায় সাত মাস পরে আমাদের একজন পরিচিত তিব্বতীয় বন্ধু সির্থ্যাংয়ের নিকটবর্ত্তী কুথোং নামক স্থানের এক সহস্র দেবমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি আমরা যে ধনী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিলাম তাঁহার সহিত

পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমরা তিব্বতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিলাম এবং সাতদিন পরে ১৫ই আগষ্ট জেম্বি ফিরিয়া আসিলাম।

আমরা ফিরিবার পথে নানা গ্রাম, গোম্ফা এবং অনেক ছোট ছোট সহর দেখিয়াছিলাম। সে-সকলের সবিস্তারে বর্ণনা করিবার আবশ্যক করে না।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ ৪ঠা অক্টোবর। আমরা বহু পর্য্যটনের পরে অবশেষে জিংচো নামক স্থানের গোম্ফার কাছে আসিলাম। এখান হইতে ক্রমাগত গিরিসঙ্কট পথে চলিতে চলিতে ১২ই নভেম্বর তারিখ দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা যে পথে তিব্বতের ভিতর দিয়া মোঙ্গোলিয়া গিয়াছিলাম ফিরিবার সময় কিন্তু সে-পথে আসি নাই। এই পথে আমাদের যথেষ্ট ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেন-না সারা পথে বরফ পড়িয়া পথ-চলা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। এ-জন্য অনেক সময় আমরা ইচ্ছানুরূপ পথ চলিতে পারি নাই। আমরা তাচিয়েন্ নামক ছোট সহরে আসিলে দুইজন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক আমাদের সহজ ও সুগম পথ নির্দ্দেশ করিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইরূপে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পণ্ডিত কিষণ সিংহের তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়া ভ্রমণ শেষ হইয়াছিল।

কিন্‌থাপ

ব্রহ্মপুত্রের উৎস-সন্ধানে

[কিন্‌থাপ নামে একজন সিকিমি ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং হইতে ব্রহ্মপুত্রের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করেন। ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে কিন্‌থাপই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মপুত্রের উৎস-সন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিবরণী (Records of the Survey of India 1879-1892) তে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্‌থাপ দুই বৎসর তিব্বতের অজ্ঞাত প্রদেশে জীবন বিপন্ন করিয়া অভিযান করিয়াছিলেন। অনেকেই কিন্‌থাপের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। লৌহিত্যের বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুত্র এবং অধুনা তিব্বতের সাংপো। এই বৃহৎ নদের উৎস-সন্ধানে কিন্‌থাপ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতের ও এক হিসাবে জগতের ব্রহ্মপুত্রের উৎস-সন্ধানের ইতিহাসে কিন্‌থাপের নাম প্রথম অভিযানকারী রূপে সগৌরবে উচ্চারিত হইবে।]

ব্রহ্মপুত্র ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ নদ বা নদী। তিব্বতের দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে ইহার জন্ম। সে-দেশে এই নদীর নাম সাং-পো (Tsang-po)। সাংপো তিব্বতের পর্ব্বতশ্রেণীর গায়ে গায়ে অধিত্যকা ও উপত্যকা প্রদেশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। কোথা হইতে এই নদীর উৎপত্তি? আর কোথায় এই নদী যাইয়া মিশিয়াছে তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে এই সাং-পো নদী তিব্বতের রাজধানী লাশা সহরের পার্শ্ব

দিয়া প্রবাহিত হইয়া শেষটায় দক্ষিণ দিকে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আগে কোন শ্বেতাঙ্গ লাশা নগরীতে পদার্পণ করেন নাই। কাজেই এই নদীর উৎস-সন্ধানে কোনও শাদা মানুষ উহার পূর্ব্বে যাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যদি সাংপো আর ব্রহ্মপুত্র নদ অভিন্ন হয় তবে নিশ্চয়ই কোন উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে জলপ্রপাতের আকারে ইহার পতন সম্ভব। কিন্তু কোথায় সে উৎপত্তি স্থান? কোথায় সেই প্রপাত? কে তাহার সন্ধান লইবে?

সে-কালের লোকেরা ধারণা করিতে পারিতেন না যে ব্রহ্মপুত্র নদ—সমুদ্র-সমতা হইতে প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ মানস-সরোবরের কাছাকাছি উৎপত্তিলাভ করিয়া সেই উচ্চতা প্রায় সমানভাবে তিব্বতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আসাম-সীমান্তে নামিয়া আসিবার সময় ১০০০ ফিট নিম্নে নামিয়া আসিতে পারে এইরূপ কল্পনা সেকালের বৈজ্ঞানিকেরা কেহ করিতে পারেন নাই।

মানুষের মনে নদ, নদী, পাহাড়-পর্ব্বত সম্বন্ধে স্বাভাবিক-ভাবে নানা কল্পনা আসে। ব্রহ্মপুত্র নদ সম্বন্ধেও যুগে যুগে মানুষ কত কল্পনাই না করিয়া আসিয়াছে! সে-সব কাহিনী এখনও নানাজনের মুখে নানাভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। সে-কালের কোন ইংরাজ নিষিদ্ধ দেশে যাইতে পারিতেন না।

যদিই বা কেহ ছদ্মবেশে যাইতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে তিব্বতের ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। আর তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করাও ত সহজ নহে। কিন্তু যাহাদের মনে দুর্জ্জয়কে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তাহাদিগকে কি কেহ নিরস্ত করিতে পারে?

ভারতীয় জরিপ বিভাগের কাপ্তেন হারম্যানের (Captain Harman) মনে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস-সন্ধানের ইচ্ছা হইল। তিনি দার্জ্জিলিং আসিলেন। সেখানে নিমসিং নামে একজন সিকিমকে কি ভাবে সেক্সটাণ্ট যন্ত্র (Sextant) বা কৌণিক দূরত্ব মাপের যন্ত্র এবং দিগ্‌দর্শন (Compass) ব্যবহার করিতে হয়, সে-সব শিক্ষা দিলেন। কি ভাবে মানচিত্র দেখিতে হয়, মানচিত্র আঁকিতে হয়, পর্ব্বতের উচ্চতার পরিমাপ করিতে হয়, এ-সব বিষয়ে কাপ্তেন হারম্যান নিমসিংকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিমসিংয়ের পূর্ব্বে তিনি কিষণসিংহ নামক আর একজনকেও এ-বিষয়ে উদ্যোগী করিয়াছিলেন। কিন্তু একা একজনের পক্ষে ত জরিপের কাজ করা চলে না, দু'জন না হইলে চলাফেরার সুবিধা হয় না, কাজও দ্রুত অগ্রসর হয় না।

সে-সময়ে দার্জ্জিলিংয়ের বাজারে কিন্থাপ নামে একজন সিকিমি দর্জী ছিল। সে এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিমসিংয়ের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সিকিমি-কিন্থাপ লোকটি

বেঁটে খাটো রকমের ছিল, চোখ দু'টি ছিল বেশ তীক্ষ্ণ, কপালটা বেশ চওড়া আর তাহার মাথায় ছিল একরাশ চুল। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত যে হাঁ, এ কাজের মানুষ বটে, একে কোন কাজের ভার দিলে সে কাজের জন্য আর ভাবিতে হইবে না—আর এ-যেন অজানার সন্ধানী হইয়াই জন্মিয়াছে।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিন সকালবেলা নিমসিং ও কিন্‌থাপ অজানা পার্ব্বত্যপথে সাংপো নদীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিল : তাঁহারা দারুণ শীতের মধ্যে পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রায় ১২,০০ ফিট উচ্চ পথ ধরিয়া সাংপো নদীর গতি-পথ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাতে ছিল জপমালা। পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জপের গুটিতে হাত দিতেন। এক কথায় জপের মালা গণিতে গণিতে তাঁহারা পথ চলিতে-ছিলেন। আমাদের এই দুইজন অভিযানকারী পথে পথে জরিপ করিতে করিতে অবশেষে গয়লা নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই জায়গাটি ছিল ঘন বনে ঢাকা। এই অধিত্যকার আশে-পাশে ছিল তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী : শিখরের পর শিখর তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখান হইতে সাংপো নদীর গতি উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিমসিং ও কিন্‌থাপ গয়লা হইতে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন,—

সাংপো নদী আসামের প্রান্তভাগ হইতে লম্বালম্বি দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। সেকালের জরিপ বিভাগের কর্ত্তারা এবং বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কিন্থাপের শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল দুর্জ্জয়কে জয় করিবার মত উষ্ণ রক্তধারা। কোন বিপদেই তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িত না। মৃত্যু-ভয় তাঁহার ছিল না, অজানাকে জয় করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে কিছুতেই পিছু হটাইত না। তিনি নিমসিংয়ের কাছে জরিপ করিতে শিখিয়াছিলেন কিন্থাপ আবার সাংপো নদীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলেন। এইবার তাঁহার সহযাত্রী হইলেন একজন চীন দেশীয় শ্রবণ বা লামা। এই লামা পূর্ব্বে তিব্বতের এক বৌদ্ধ-বিহারে ছিলেন, দৈবক্রমে ভারতীয় জরিপ বিভাগে আসিয়া পড়েন। কিন্থাপকে এইবার বলা হইয়াছিল যে তিনি যেন নির্ভীকভাবে সাংপো নদীর গতিপথের অনুসরণ করিয়া কেবলি অগ্রসর হইতে থাকেন। যদি তিনি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতে ফিরিয়া না আসেন, তবে যেন প্রত্যহ ৫০ খানি করিয়া ৫০০ খানি কাঠের টুকরা নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দেন, জরিপ বিভাগের লোকেরা নীচের দিকে সেই সব কাষ্ঠ খণ্ডের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এবং তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে কিন্থাপ বাঁচিয়া আছেন কিনা।

তীর্থযাত্রী ও পুণ্যপ্রার্থী বৌদ্ধ লামাদের তিব্বতের কোথাও যাইতে বাধা নাই, আর লাশা ত তাঁহাদের তীর্থস্থান। কাজেই এইবার কিন্‌থাপ নিঃশঙ্কচিত্তে চৈনিক লামার সহযাত্রীরূপে সাংপো নদীর উৎস-সন্ধানে চলিলেন। তাঁহার পিঠে ছিল একটি থলিতে কাঠের বোঝা। তিব্বতের লোকেরা তীর্থযাত্রীদের খুব সমাদর করে। কাজেই এ-যাত্রায় তাঁহাকে কোন তিব্বতীয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিল না। কিন্তু এই চীনা লামাটির মনে অজানার সন্ধানের জন্য কোন আগ্রহ ছিল না। লামা কোন একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলে বেশ ভালভাবে থাকিবার, খাইবার এবং শুইবার ব্যবস্থার জন্যই ব্যাকুল হইতেন। যে গ্রামে এরূপ বাস ব্যবস্থা মিলিত, সেই গ্রাম হইতে চৈনিক লামা এক পাও বাড়াইতে চাহিতেন না। চারি মাস চলিয়া গেল, লামা বেচারা কিন্‌থাপকে মহা বিপদে ফেলিলন, তিনি কিছুতেই নড়িতে চাহেন না! কোন রকমে লামাকে যৎকিঞ্চিৎ নগদ মুদ্রা দিয়া প্রলুব্ধ করিয়া কিন্‌থাপ তবে আবার যাত্রা-পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

কিন্‌থাপ ও চীনা লামা পথ চলিতে লাগিলেন। কখনও কখনও তাঁহাদের গুহার মধ্যে ঘুমাইতে হইত, কখনও ভিক্ষা করিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করা হইত,—কখনও কখনও অনাহারে দিন কাটিত। এইভাবে কিন্‌থাপ ও তাঁহার সঙ্গী লামা

পেমকোইচাং নামক একটি জায়গায় আসিলেন। লাশা সহর ঐস্থান হইতে ৩২০ মাইল দূর। শেষ পঁচিশ মাইল পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম—খাড়া পাহাড়। সে পাহাড়ে শিলাস্তূপের পর শিলাস্তূপ। কোন দিকে উঠিবার কোন পথ নাই। কোন রকমে তাহারা একটা খাড়া পাহাড়ের উপর উঠিল। সেখান হইতে তাহারা দেখিতে পাইল প্রায় ৩০০০ ফিট নীচ দিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে সাংপো নদী বহিয়া চলিয়াছে। জলের কি ভয়ঙ্কর বেগ!

পেম্‌কোই-চাংয়ে আসিয়া কিন্‌থাপ দেখিতে পাইল যে সাংপো নদী এখান হইতে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। বৌদ্ধমঠ হইতে নদী অনেকটা দূর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ বিহারটিতে সাত আট জন লামা বাস করিতেন। কিন্‌থাপের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এইভাবে সাংপো নদী বহিয়া যাইয়া একটি জলপ্রপাতের আকারে নিম্নে পড়িয়াছে। প্রপাতের নীচে একটি হ্রদের মত জলাশয় রহিয়াছে। সম্ভবতঃ জলপ্রপাতের উচ্চতা প্রায় ১৫০ শত ফিট হইবে।

এই পেম্‌কোইচাংয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের বুক দিয়া সাংপো একটি 'ক্যানিয়নে'র দুর্গম পথ-অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। কাজেই এমন কাহারও সাধ্য নাই যে ঐ নদীর আর অনুসরণ করিতে পারে। এখান হইতে লামা ও কিন্‌থাপ

অনেকদূর পর্য্যন্ত নীচের দিকে নামিয়া আর একটা পথের সন্ধান করিয়া লইলেন। এইবার তাঁহারা যে গ্রামে আসিলেন, সেখানে আসিয়া চীনা লামাটি বেশ চালাকি করিলেন, তিনি কিন্‌থাপকে জোঙ্গ-পোন্ বা গ্রামের সর্দ্দারের নিকট সামান্য অর্থ গ্রহণে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিন্‌থাপ বুঝিতে পারিলেন যে গ্রামের সর্দ্দার তাঁহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছে। ইতিমধ্যে তাহার পিস্তলটি এবং একটি কম্পাস ও অন্যান্য কিছু কিছু আস্‌বাব ও যন্ত্রপাতি সর্দ্দার কাড়িয়া লইয়াছিল। এ-জন্য কিন্‌থাপ ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে অন্য যে একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল, তাহা লুকাইয়া রাখিলেন। এ-ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৮৮১ সালে। অতি কষ্টে কৌশল করিয়া কিন্‌থাপ এই গ্রামের সর্দ্দারের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

এইভাবে মুক্তিলাভ করিয়া কিন্‌থাপ চলিতে চলিতে মাপুং নানক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। এ-দিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতি চমৎকার। অদূরে তুষারমণ্ডিত ধবল গিরি-শ্রেণী। অধিত্যকা-প্রদেশে ধানের ক্ষেত ও পিচফলের বাগান। আর একটি সুন্দর পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ছিল একটি বৌদ্ধ মঠ।

তারপর কি হইল, সে-কথা আমরা এখানে কিন্‌থাপের নিজের

ভাষায় শুনাইতেছি—"আমি এখানে শুনিলাম যে আমাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য জোঙ্গপোন্ পঞ্চাশ জন লোক পাঠাইয়াছে! আমি এই মঠের লামাকে তিন বার নমস্কার করিয়া জোঙ্গপোনের কথা বলিলাম। লামা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার বাপ-মা বাঁচিয়া আছে কিনা এবং আমি কোথায় যাইতেছি। আমি বলিলাম, তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে লাশা চলিয়াছি। আমার বাপ-মা কেহই বাঁচিয়া নাই। তারপর আমি লামার কাছে মিনতি জানাইলাম যে তিনি যেন আমাকে জোঙ্গপোনের লোকের কাছে প্রত্যর্পণ না করেন।"

জোঙ্গপোনের লোকেরা আমার এই স্থানে আসিবার পাঁচ দিন পরে আমাকে লইবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু লামা তাঁহাকে অমার মূল্য বাবদ পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কাজেই আর কোনও গোল হয় নাই। আমি সাড়ে চার মাস লামার কাছে ছিলাম। পরে তাঁহার নিকট হইতে এক মাসের ছুটি লইয়া তীর্থ দর্শনে অর্থাৎ নদীর উৎস সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।"

কিন্থাপ আবার অন্য একটি বিহারে আসিলেন। এইখানে কাঠগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সাংপো নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই কাঠের টুক্‌রাগুলি ভাসিতে ভাসিতে আসামের পথে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিল। কিন্তু সেইগুলির

দিকে কে লক্ষ্য করিবে? কাপ্তেন হারম্যান তখন মারা গিয়াছিলেন।

কিন্‌থাপ এইবার লাশা গিয়াছিলেন। সেখান হইতে জরিপ বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট পিস্তল এবং কম্পাস হারাইবার কথা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

লাশা হইতে কিন্‌থাপ মাপুং ফিরিয়া আসিয়া সেই ত্রাণকারী লামার কাছে কিছুদিন ছিলেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। যাত্রাপথে এই সাহসী অভিযানকারী দর্জির কাজ করিয়া নিজের খাদ্য সংস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কিন্‌থাপ দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কিন্‌থাপ ইংরাজী জানিতেন না ও লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিতেন না। মুখে মুখে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ও আবিষ্কারের কথা বলিয়া যাইতেন। কিন্‌থাপ তিন বৎসর কাল যে পাহাড়, পর্ব্বত ও উপত্যকা, বন-জঙ্গল দেখিয়া আসিয়াছিলেন সে-সব কথা সে সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন। এবং অপরে তাহা লিখিয়া লইত। তাঁহার কথা ভৌগোলিকেরা প্রথম বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি জরিপ বিভাগের কর্ত্তারাও তাঁহার বর্ণিত বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। ১৯১১ সালে ভারতীয় জরিপ বিভাগ কিন্‌থাপের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তাঁহার এই অভিযানের কাহিনী জরিপ বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ইংরাজীতে অনুবাদ

করিয়াছিলেন। কিন্থাপ যে চারি বৎসর কাল এই অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সে-সময়কার সব কথা, সবদিন তিনি লিখিয়া লইতে পারেন নাই।

কিন্থাপের পর জরিপ বিভাগের পেমবারটন্ (Mr. Pemberton) ও ট্রেন্চার্ড (Mr. Trenchard) সাহেবও সাংপো নদীর উৎস সন্ধানে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সংপো নদীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই ভীষণ পথে বৎসরে পনেরো দিনের বেশী চলাচলের সুযোগ থাকে না। দিহাং অভিযানের বেলী (Mr. Bailey) ও মুর্শেদ (Mr. Moorshed) পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া ১৫,৪০০ ফিট উচু একটি অজানা পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে অন্য একটি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণীও দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্থাপ সে-পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বেলী এবং মুর্শেদ সেইদিকে অগ্রসর হইতে যাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর-দিকের পথ ধরিলেন এবং দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া পশ্চিম দিকে সাংপো নদীর সন্ধান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা গিয়াছিলেন দক্ষিণ দিকে সে এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে। তাঁহাদের এ-অভিযানে অভিনবত্ব ছিল।

সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র নদের জলপ্রপাত

সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র নদের প্রপাত সম্বন্ধে কিন্‌থাপের বর্ণনা যে কতদূর সত্য সে-সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন মুরশেদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন ও কিন্‌থাপ সাংপোর জলপ্রপাতের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে সামান্য কিছু ভুল থাকিলেও তাঁহার বর্ণিত বিবরণ সত্য। প্রায় চারি বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া কিন্‌থাপ অন্যের কাছে যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহাতে অনুবাদক এক স্থানের নাম অন্য স্থানের সহিত গোলমাল করিয়া ঐরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মিঃ বেলী এবং মিঃ মুরশেদ নামক জরিপ বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী সাংপোর গতিপথ অবলম্বন করিয়া মাত্র দশ মাইল পথের বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাজেই ঐ ভূভাগকে অনাবিষ্কৃত দেশ বলিতে পারা যায়। এই পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের কয়েকটি জলপ্রপাত রহিয়াছে। এই জলপ্রপাত কয়টির জন্যই ব্রহ্মপুত্র অতি সহজে নীচের দিকে নামিয়া আসিতে পারিয়াছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কিংডেনওয়ার্ড এবং লর্ড ক্রুড্‌ নামে দুইজন অভিযানকারী সাংপোর অনাবিষ্কৃত প্রদেশসমূহ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করেন। তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিন্‌থাপের

বর্ণিত জলপ্রপাত সত্যসত্যই আছে কি না তাহার সন্ধান করা।

পেমাকোচুংয়ের পর কোন পথ ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে পথ তৈরি করিয়া চলিতে হইয়াছিল। সে-পথ ছিল অতি ভীষণ। দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সাংপো নদী ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে উন্মত্ত জলধারা বুকে লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা যে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার প্রায় ১০০০ ফিট নীচ দিয়া সাংপো নদী কল-প্রবাহে বহিয়া যাইতেছিল। এই পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন কোথায় যেন পাহাড়ের বুকে সাংপো আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেদিকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটি অতি সুন্দর জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতটি পেমাকোচুংয়ের কাছাকাছি। এই জলপ্রপাতটি ত্রিশ ফিটের বেশী উচু নহে। কিন্তু জলপ্রপাতের শোভা অতি চমৎকার। জল-প্রবাহের উপর সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রপাতের বুকে শত শত রামধনুর সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য সত্যই মেঘমুক্ত দিনে সূর্য্যের কিরণে এই জলপ্রপাতের বুকে শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়। কিন্থাপ ১৫০ ফিট উচ্চ যে জলপ্রপাতের কথা বলিয়াছিলেন সেইটির নাম হইতেছে সিংচি-চোগি। এই জলপ্রপাতটি ত্রালা

নামক স্থানের কিছু নীচের দিক্ হইতে উৎপন্ন একটি ছোট নদীর উৎসমুখে অবস্থিত। গয়ালার কাছাকাছি সাংপো নদীর সহিত উহা মিলিত হইয়াছে।

লালার তিব্বত-যাত্রা

লালা নামক একজন পার্ব্বত্য অধিবাসীর হিমালয় অভিযান-কাহিনী এইবার বলা হইতেছে। লালা ছিরমূর নামক একটি পার্ব্বত্য গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লালা দক্ষিণ পূর্ব্ব তিব্বতের দুর্গমপথে অভিযান করিয়াছিলেন। আমরা সগৌরবে ভারতীয় এই বীর অভিযানকারীর বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ছিরমূর পল্লীর অধিবাসী লালা দার্জ্জিলিং হইতে সিকিমের পথে তিব্বত-যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি সিগাৎসী নামক স্থানের কাম-পা বা তিব্বতীয় সীমান্তের একটি দুর্গের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি তিব্বতের প্রধান নদী সাংপোর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া ৫০ মাইল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া পালতি হ্রদের নিকটে আসিয়া উপনীত হন। এখান হইতে পুনরায় সাংপো নদীর পারে পারে চলিতে চলিতে সিতাং আসেন। এই পথ ধরিয়া আসামের মধ্য দিয়া তিব্বতে গমন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু মনতনগোঙ্গ নামক স্থানে আসিয়া বাধা পাইলেন। এজন্য তাঁহাকে পুনরায় সিগাৎসি ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। লালা পুনরায় সিগাৎসি হইতে যাত্রা

আরম্ভ করিয়া গিয়াংৎসী আসেন। সেখান হইতে কালাসার, ফারি এবং চুম্বি (সিকিমের রাজার গ্রীষ্মাবাস) হইয়া জেলিপলা উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লালা এই অভিযানে একটি কম্পাস বা দিগদর্শন ও একটি সেক্সটাণ্ট যন্ত্র মাত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রথম যাত্রায় লালা অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা এবং অভিযানকারীর উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সঙ্গের পকেট ঘড়ি, থার্মোমিটার ইত্যাদির সাহায্যে লালা পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতার পরিমাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে লালা থাংগো নামক গ্রামে আসেন। এই গ্রামটি সিকিমের দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। ডক্টর হুকার ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে সিকিম গিয়াছিলেন। হুকার ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে লালা কোন্ কোন্ গ্রাম, দুর্গ, নদী ও পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বতে গিয়া পৌঁছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। কাংরা-লামা বা লেচেন গিরিপথ পর্য্যন্ত পথের পরিচয় হুকারের তৈয়ারী মানচিত্রখানি হইতে বেশ সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। এইজন্য লালার অভিযান-পথ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ বিদ্যমান নাই। সিগাৎসি, গিয়াংৎসি এবং সিতাংএর পথে লালার পূর্ব্বেও কয়েকজন অভিযানকারী যাতায়াত

করায় এই পথের সম্বন্ধে লালা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে অসত্য নহে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। পণ্ডিত নৈনসিং ১৮৬৫-১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তোয়াং আসেন। লালাও তখন তোয়াং আসিয়াছিলেন। এই পথের বর্ণনা উভয়েরই একরূপ।

লালা যখন কাঙ্গরা-লামালা হইতে কামপার (দুর্গের) তিন মাইল দূরে আসেন তখন একদল ঘোড়সোয়ার আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুর্গের অধিনায়ক জোঙ্গপোনের নিকট লইয়া গিয়াছিল। জোঙ্গাপন লালাকে দুর্গের বাহিরে একটি ঘরে পনেরো দিন কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি কোনরূপ শারীরিক নির্য্যাতন না হইলেও তাঁহাকে মৌখিক নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এখানে তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য, কোথায় সে যাইবে, কি তাঁর প্রয়োজন ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সিগাৎসির শাসন-কর্ত্তাও তাঁহাকে তিন দিন নজরবন্দী রাখেন ও পরে একজন রক্ষীর লালার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় জোঙ্গপোন লালাকে পাঁচ মাস কাল সিগাৎসিতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে এই বন্দী অবস্থায় তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, লালা ইচ্ছানুরূপ নগরের নানা স্থানে বেড়াইতে পারিতেন। এই ভাবে সিগাৎসির নানা ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ায় লালা

স্থানীয় বিবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়েই লালা স্থানীয় বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার তাসিলুনপো সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। পাঁচ মাস পরে একদল বণিক আশ্বিন মাসে সিগাৎসি আসিলে পর লালা সেখান হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং পুনরায় যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লালা সিগাৎসি পরিত্যাগ করেন। সেখান হইতে সাংপো নদীর তীরে অবস্থিত জাগ্‌সা নামক গ্রামে আসেন। এখানে একটি লোহার পুল আছে। এই লোহার সেতুটি পার হইলে দেখা যায় যে তুই দিকে তুইটি পথ গিয়াছে। একটি চলিয়াছে লাশার দিকে অপরটী চলিয়াছে চক-সামচোরি নামক স্থানে। এই স্থানে সাংপো নদীর স্রোতোধারা নানাভাবে বিভক্ত হইয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে।

জাগ্‌সা হইতে লালা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া ইয়া-সিক নামক একটি হ্রদের কাছে আসেন। এই হ্রদটির সম্পর্কে তিনি অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। লালা বলেন যে এই হ্রদটির মধ্যে একটি ছোট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের সহিত মূল ভূভাগের একটি সংযোজক সেতু রহিয়াছে। সেই পথে লোকজন যাতায়াত করে এবং পশুরাও বিচরণ করিয়া থাকে। এখানে চারিদিকে

বনরাজি-শোভিত পর্ব্বতশ্রেণী থাকায় পাহাড়ের অধিত্যকা প্রদেশে পালে পালে পশুদের বিচরণ করিতে দেখা যায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈনসিং যখন এ-অঞ্চলে আসেন তখন তিনিও এই স্থানের বর্ণনা লালার অনুরূপই করিয়াছেন।

এই হ্রদের তীর হইতে লালা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং সাংপো নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া সিতাং পর্য্যন্ত আসেন ও সোগি নামক স্থানে অল্প কয়েক দিন অবস্থান করেন। এইখানকার লোকজনেরা ও তিব্বত-সরকারের প্রহরীরা লালাকে সতর্ক করিয়া দেন যে সাংপো নদীর পথ ধরিয়া তাহার ন্যায় একজন নিঃসঙ্গ পর্য্যটকের পক্ষে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হইবে না। কেননা ঐপথে দস্যুদলের ভয় খুবই বেশী। ঐখানে যেমন দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের আশঙ্কা তেমনি পার্ব্বত্য দুর্দ্দান্ত অধিবাসীদেরও বাস, কাজে কাজেই ঐ পথে পদে পদে জীবন-নাশের সম্ভাবনা। এইরূপ স্থলে লালা কি করিবেন? তিনি দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন এবং কারকাংয়ের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ পথ ধরিয়া আসাম হইয়া ফিরিয়া আসিবেন। পণ্ডিত নৈনসিং ১৮৭৩-৭৫ সালে এই পথ ধরিয়া তিব্বত গিয়াছিলেন। লালা থোয়াং পৌঁছিবা মাত্রই তিব্বত সরকারের লোকেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া এক মাস আটক রাখে। সৌভাগ্যবশতঃ একজন

তিব্বতীয় রাজপুরুষের কৃপায় অবশেষে তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন। এই ভাবে বার বার বন্দী হওয়ায় তাঁহার যাত্রাপথে বহু বাধা জন্মায়। তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া পুনরায় সিগাৎসির পথে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিতে যত্নবান হইলেন।

লালার প্রত্যাবর্ত্তন পথেও তাঁহাকে পুনরায় ফারি নামক স্থানে একমাসকাল বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। এখানে একজন চীন দেশীয় রাজকর্ম্মচারির অনুকম্পায় তিনি মুক্তি লাভ করেন।

লালার এই অভিযানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—গিয়ামসেনা নামক হ্রদের কথা। লালা এই হ্রদের তীরে বসিয়া একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রতি পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট অন্তর হ্রদের গর্ভ হইতে বজ্রধ্বনির ন্যায় এক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। লালা প্রায় চারি ঘণ্টাকাল এই হ্রদের তীরে বসিয়াছিলেন—এই চারি ঘণ্টাকালই তিনি বার বার ঐরূপ ভাবে হ্রদের ভিতর হইতে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের বুকের সলিল-রাশির কোনরূপ আবর্ত্তন বা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখা যায় নাই। স্থানীয় একজন রক্ষী বা চৌকী লালাকে বলিয়াছিল যে হ্রদের

তলাকার জমাট বরফস্তর ভাঙ্গিবার দরুনই উপর হইতে এইরূপ শব্দ শোনা যায়। যদি বরফ ভাঙ্গার জন্যই ঐরূপ শব্দ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে হ্রদের উপরিভাগে বরফকে ভাসমান অবস্থায় দেখা যাইত, কিন্তু হ্রদের জলের উপর এরূপ কোনও বরফ কোন কালেই দেখা যায় না বলিয়াও প্রহরী লালাকে বলিয়াছিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে লালা তাঁহার প্রথম তিব্বত-অভিযান শেষ করিয়া দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বারের মত তিব্বত-অভিযান করিয়াছিলেন।

তিব্বতে বাঙ্গালী—শরৎচন্দ্র দাশ

বাঙ্গালী তিব্বত-যাত্রীদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দাশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র দাশ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের প্রায় কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি এবং নৈতিক নিষ্ঠা-পদ্ধতি এবং ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিব্বতে গমন করেন। তাঁহার লিখিত লাশা ও মধ্য তিব্বতের বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালার অন্তর্গত আলমপুর নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় তিনি স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্টের (Sir Alfred Croft) প্রীতি ও অনুগ্রহ লাভ করেন। সে সময় হইতেই শরৎচন্দ্র বরাবর ক্রফ্ট্ সাহেবের নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছেন। ক্রফ্ট্ সাহেবের চেষ্টা ও যত্নেই শরৎচন্দ্রের তিব্বত-যাত্রাও সম্ভবপর হইয়াছিল।

১৮৭৭ সালে তিনি দার্জ্জিলিংএর তিব্বতীয় বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দাশ মহাশয় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত্ত বিভাগের একজন ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন ছোট

লাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল সাহেব সেই বৎসরেই প্রথম ঐ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করিয়া শরৎচন্দ্র তিব্বতীয় ভাষা শিখিবার জন্য প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর পরে তিনি স্বাধীন সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধমঠ পরিদর্শনে গমন করেন। সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সহিত সিকিমের রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সিকিম-বাসীদের ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ ও পরিচয় হয়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের অন্তর্গত পেমাইয়াংসি নামক মঠের উগায়েন-গিয়াৎস্থ নামক একজন লামা তিব্বতীয় বোর্ডিং স্কুলে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পেমাইয়াংসি নামক মঠের সন্ন্যাসীরা বিবিধ উপঢৌকন সহকারে উগায়েনগিয়াৎস্থকে তাসিলুনপো ও লাশা নগরীতে প্রেরণ করেন।

শরৎচন্দ্র এ সময়ে তিব্বত যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লামা উগায়েনগিয়াৎস্থর তাসিলুনপো ও লাশা যাইবার সুযোগে তিনিও নিষিদ্ধ নগরী লাশায় গমন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার ও তৎ সম্বন্ধে উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রের তিব্বত যাত্রার সাহায্যকল্পে লামা ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃকও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। লামা

উগায়েনগিয়াৎস্থ লাশা নগরীতে উপস্থিত হইয়া শরৎচন্দ্রের পক্ষে অনেক অনুরোধ করিলেও কোন ফল না হওয়ায় লামা তাশিলামার দীক্ষাগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাসিলুনপো গমন করেন। দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসারে তাশিলামা শরৎ-চন্দ্রকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য উগায়েনগিয়াৎস্থর দ্বারা একখানি আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন। শরৎচন্দ্র তাসিলুনপো নগরের প্রধান মঠের একজন ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হইলেন। তিনি যে পথ দিয়া আসিতে ইচ্ছা করেন আসিতে পারিবেন, তৎসম্পর্কেও অনুমতিপত্র প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত তাশি-লামা এরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে কোনও জোঙ্গপোন বা 'জঙ্গপন' (বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা) বা তিব্বতবাসীকে তাঁহার এই আদেশলিপি বা ছাড়পত্র প্রদর্শন করিলে তাঁহারা এই ভারতীয় পণ্ডিতকে সাহায্য করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গের যে সকল জিনিষ পত্র থাকিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তাসিলুনপো বিহারের অন্তর্ভূ‌র্ত পেনচিনরেনপোচ্ বিহারটির সম্বন্ধে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্য্যটক ও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

লামা উগায়েনগিয়াৎস্থ কর্ত্তৃক আমন্ত্রণলিপি পাইয়া শরৎচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লামা সমভিব্যহারে একটি ফোটো-

গ্রাফের ক্যামেরা, একটি পকেট সেক্‌সটাণ্ট বা কোণ-পরিমাপক যন্ত্র, একটি দিগদর্শনযন্ত্র, একটি থার্ম্মোমিটার, একটি দূরবীক্ষণ ও নগদ দেড়শত টাকা মাত্র সঙ্গে লইলেন। মঠে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে উপহার দ্রব্যাদিও কিছু কিছু ছিল।

শরৎচন্দ্র এই তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কে বলিয়াছেন: "আমার মনে অতি শৈশব হইতেই একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল তুষারাবৃত হিমালয় গিরিশ্রেণীর অপর পারস্থিত নিষিদ্ধ নগরী লাশা দেখিব। কোনরূপ রাজনীতির অভিসন্ধি বা অন্যরূপ কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই আমার মনে উদিত হয় নাই। নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশ করিবার পথে বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা আমার মনে আসে নাই। ঈশ্বরের প্রতীক্ লামাদিগকে দর্শন করিব, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই আমি তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার মনে অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ রাজপদ লাভের প্রলোভন ইত্যাদি কিছুই স্থান পায় নাই।"

"আমি দার্জ্জিলিঙ্গের তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার সময় ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনবার সিকিম রাজ্যে গিয়াছিলাম। সিকিমে যাইবার পর আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব চিত্র প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

আমি যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল নির্ম্মল প্রভাতে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত ধূসর ও বিরাট দিগন্ত প্রসারিত অভ্রশ্রেণীর ভীমকান্ত রূপ ও অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ও তাহাদের কল্পনাতীত উচ্চতা অবলোকন করিতাম, তখন আমার হৃদয় এক মহান্ ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িত। এই অনন্ত হিমারণ্যের অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতগুহার নিভৃত নিলয়ে যে সকল ঋষিকল্প লামা-সন্ন্যাসীগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের পুণ্যধামে যাইবার জন্য মনোমধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত। আমার মনে অপরিজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব বৌদ্ধ-মঠের অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের অমূল্য সাহিত্য-রত্নের আবিষ্কারের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। যখনই আমি শুভ্রতুষারবিমণ্ডিত গৌরী-শঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার অত্যুচ্চ শিখরের দিকে চাহিয়া তিব্বতের সুনীল গগনপ্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম, তখনই তিব্বতের মঠবাসী দেবকল্প লামা ও তাঁহাদিগের পবিত্র বিহারসমূহ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত। মনে মনে ভাবিতাম বিধাতা কি আমার এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন না?"

"তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার সময় আমি লামাদের সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই সকল গ্রন্থে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের মহাত্মা অতীশ ও অন্যান্য কয়েক

জন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের কথা গল্পচ্ছলে লিখিত ছিল। অতীশের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তাঁহার চেষ্টায় তিব্বতীয়দের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং মিলার্পা নামক একজন পণ্ডিত কিরূপ বিস্ময়কর ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিবার জন্য আমি একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।”

“আমার বিশ্বাস ছিল তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে ও তত্রত্য অধিবাসীদের সহিত কথোপকথনে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে তিব্বত গমন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাসিলুনপো ও লাশা নগরীর কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নিকট আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার সহকারী শিক্ষক লামা উগায়েনগিয়াৎসু উক্ত পত্রাদিও তিব্বত গমনের সময় সঙ্গে লইয়াছিলেন। আমি ইহাও শুনিয়াছিলাম যাহারা তিব্বতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ভালবাসে, তিব্বতীয়গণ তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।”

“লামা উগায়েনগিয়াৎসু প্রায় তিন মাস কাল দৌত্যকার্য্য করিয়া যখন আমার জন্য আমন্ত্রণলিপি লইয়া আসিলেন, তখন আমি তাশিলামার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার এ, ক্রফট্ মহোদয়কে দেখাইলাম এবং অবশেষে ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লাভ করিয়া কলিকাতা আসিয়া ভারতীয় সার্ভে অফিসে জরিপ-সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করিয়া পর বৎসর জুন মাসে তিব্বত যাত্রা করিলাম।"

শরৎচন্দ্র এই বার নিশ্চিন্ত হইয়া লামা উগায়েনগিয়াৎস্থর সহিত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিব্বত-যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক ও দুইজন কুলি অনুগমন করিয়াছিল, এইবার তিনি প্রধান মন্ত্রীর অতিথি হিসাবে মাত্র ছয়মাস কাল তিব্বতে ছিলেন। এই ছয়মাস শরৎচন্দ্র তাসিলুনপোর মঠ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীর গ্রন্থমালা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং আসিবার সময়ে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই যাত্রায় শরৎচন্দ্র লাঞ্চনজঙ্ঘা বা কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পূর্ব্বদিকের অনেক অজ্ঞাত প্রদেশ সম্বন্ধে সন্ধান লন। তাঁহার প্রথম বারের যাত্রাপথের পরিচয় ও অভিজ্ঞতার কথা বাঙ্গালা সরকার পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্যার এ্যালফ্রেড ক্রফট্ ঐ গ্রন্থের একটী অতি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার তিব্বত-অভিযান করেন। এইবারও তাঁহার বন্ধু উগায়েনগিয়াৎস্থ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা এ যাত্রায় পলটি বা পালতি নামক হ্রদের জরিপ করেন ও অল্প কিছুকালের জন্য লাশাও গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৮৭৬ এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে নইনসিং ও

কিষণ সিং লাশা গমন করেন। নইনসিং লাশা ও তাহার আশেপাশের জমি জমার একটা জরিপও করেন।

লাশা হইতে শরৎচন্দ্র ইয়ালুং আসেন। এই ইয়ালুং অধিত্যকায়ই তিব্বতীয়দের প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। এই যাত্রায় তিনি এক বৎসর দুই মাস কাল তিব্বতে ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লিখিত নানা তথ্য সম্বলিত তিব্বত-ভ্রমণ বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট দুইখানি বিবরণী পুস্তকে প্রকাশ করেন। একখানির নাম লাশা ভ্রমণের বিবরণ; অপরখানি হইতেছে পলতি হ্রদ, লোকা, ইয়ালুং এবং সেতিয়ার বিবরণী * এবং গভর্ণমেন্ট এই বিবরণী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোপনীয় দলিলপত্রের সামিল করিয়া অপ্রকাশিত রাখেন। পরে উহা হইতে তিব্বতীয় নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষা-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য বিলাতের 'কন্‌টেমপোরেরি রিভিউ' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়। উহার পাঁচ বৎসর পরে 'নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরি' নামক বিখ্যাত পত্রিকায়ও উহার কিছু কিছু ছাপা হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার কয়েকজন লোককে পুনরায় তিব্বতে পাঠাইবার সঙ্কল্প করেন। সে সময়ে শরৎচন্দ্রেরও উক্ত

* Narrative of a Journey of Lhasa and Narrative of a Journey Round Lake Palti (yamdok), and in Lhoks, Yarlung and Satya.

অভিযানের মনোনীত নেতা কলম্যান ম্যাকলের সঙ্গে পুনরায় তিব্বত যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রার পূর্ব্বে আলাপ ও আলোচনার জন্য শরৎচন্দ্র কয়েক মাস চীনের রাজধানী পিকিং সহরে ছিলেন। তাঁহাকে সেখানকার লোকেরা বলিত—'কা-চি-লামা বা কাশ্মীর-দেশীয় লামা'। শরৎচন্দ্র লামা উগায়েনগিয়াৎসু ও তাঁহার প্রিয় ভৃত্য ফুরচঙ্গকে লইয়া কত তুঙ্গ গিরিশিখর, কত বরফাবৃত উপত্যকা, কত নির্ঝর ও নদী অতিক্রম করিয়া যে তিব্বত পর্য্যটন করিয়াছিলেন তাহা উপন্যাসেরই মত মনোরম। যেদিন তিনি সর্ব্বপ্রথম লাশার মন্দিরসমূহ ও তথাকার মঠের চূড়া দেখিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। যে পলটি হ্রদের কথা বলিলাম, এই পলটি হ্রদ তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন পর্য্যটকের চক্ষে পড়ে নাই। শরৎচন্দ্র ক্রফট্ সাহেবের বন্ধুত্ব ও স্নেহ স্মরণ করিয়া এই হ্রদটির নাম দিয়াছিলেন—ক্রফট্ ইয়ামডো। ইয়ামডো শব্দের অর্থ হ্রদ।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও একজন অসাধারণ শ্রমশীল ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র ১৮৮২ সালে পলটি হ্রদের পরিমাণ সম্বন্ধে যে জরিপ করেন পরবর্ত্তী কালে ঐ হ্রদের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া

যাঁহারা জরিপ করিয়াছিলেন তাঁহারাও শরৎচন্দ্রের জরিপকে প্রায় নির্ভুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পলটি হ্রদের জরিপ ছাড়া, শরৎচন্দ্র লোত্রাক বা মানসসরোবরের নিকটবর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশেরও জরিপ করিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট ভারতের এই কৃতী সন্তানকে রায়-বাহাদুর, সি, আই, ই প্রভৃতি উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। শরৎচন্দ্রের স্থাপিত "বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রচার সমিতি" দ্বারা বৌদ্ধ-সাহিত্যের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্কলিত তিব্বতীয় ও ইংরাজী ভাষার অভিধান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার ন্যায় তিব্বতীয় ভাষার সাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে অতি কমই আছেন।

শরৎচন্দ্র বাল্যকালে প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ করেন গ্রামস্থ পাঠশালায়। পরে চট্টগ্রাম ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। চট্টগ্রাম হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত্ত বিভাগে ভর্ত্তি হন। শরৎচন্দ্র যে সকল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তাহার দ্বারা দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথ সুগম হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত জঙ্গরি নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নেপাল

রাজ্যের ইয়ামপাঠশালে উপনীত হন। উক্ত নগর তাম্বুর নদীর তীরদেশে অবস্থিত। এই স্থান হইতে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক গিয়ানস্থুর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাসিচোডিং নামক মঠে উপনীত হন। সেখান হইতে নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী দুরারোহ চাথাংলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া জেমু নদীর মালভূমিতে উপনীত হন, এখানে সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণী পরিক্রমণ

১৭ই জুন, ১৮৭৯। আজ সকাল বেলা আটটার সময় আমরা দার্জ্জিলিং হইতে সিকিমের অন্তর্গত জঙ্গরি নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। বেলা দশটার সময় ৯,০০০ হইতে ১২,০০০ ফিট উচু পার্ব্বত্য উপত্যকায় আসিলাম। এপথে জোঁকের ভয় নাই। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে কুসুম-সুষমা। একদিকে যেমন রোডোডেনড্রোন (Rho-do-dendron) বা রক্তদ্রোণ পুষ্পগুচ্ছের লাল রঙের শোভা, তেমনি এই অধিত্যকার বুকে কত বিভিন্ন জাতীয় সবুজ পত্রাবলী শোভিত তরুশ্রেণী যে দেখিলাম তাহা আর কতইবা বলিব। দুঃখ হইল যে উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে আমার

কোনও জ্ঞান নাই। বাখিল নামক স্থান ও জঙ্গরির মধ্যে আমাদের সঙ্গে ডক্টর ইংলিশ (Dr. Inglis) নামক একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও দার্জ্জিলিং হইতে জঙ্গরি দেখিতে চলিয়াছেন। সঙ্গীয় কুলিদের অবাধ্যতার দরুন এবং পথ-প্রদর্শকের অনভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাকে পথে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। ডক্টর ইংলিশ আমাকে বলিলেন, তাঁহার জমিদারি নিউজিল্যাণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে হিমালয় ভ্রমণের ইচ্ছা হইয়াছে তাই তিনি এ-অঞ্চলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল তাহা করিয়াছিলাম, তেমন ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে না পারায় বিশেষ মনঃদুঃখের কারণ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমরা জঙ্গরি পৌঁছিলাম। এখানে এক গোয়ালার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

জঙ্গরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। অধিত্যকাদেশ শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ। লতা, গুল্ম, তরুশ্রেণী সমুদয়ই ফুলে ফুলে শোভাময়। চমরী গোরুগুলি নিশ্চিন্ত মনে অধিত্যকার শ্যামল চারণ-ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের গোলাপী আভা দূরবর্ত্তী তুষারাবৃত শৃঙ্গরাজির উপর পড়িয়া এই সুন্দর অধিত্যকা প্রদেশটিকে অপরূপ লোহিত বর্ণসুষমায় সুরঞ্জিত করিয়া দিয়াছে।

দূরে তুষারমুকুটে শোভমান কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর আমার দক্ষিণে দেখিতে পাইতেছিলাম শ্বেত তুহিনে মণ্ডিত কাবুর গিরিশ্রেণী ; আর বাম দিকে শোভা পাইতেছে তুষারবিমণ্ডিত কাঙ্গলার পর্ব্বতে শৃঙ্গরাজি। আমাদের পশ্চাৎ দিক দিয়া রাথোঙ্গ নদী দিনরাত্রি কলরবে গিরিপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া দক্ষিণ দিকের গিরিপথে বহিয়া চলিয়াছে। আমরা এখানে একদিন ছিলাম।

১৯শে জুন। আজ বেলা দশটার সময় জঙ্গরি ছাড়িলাম। চারিদিকে এমন গভীরভাবে কুয়াসায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে আমরা সূর্য্য যে আকাশে উঠিয়াছে তাহাই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদিগকে তাঁহার পরিচিত পথ দিয়া লইয়া চলিলেন।

বেলা একটার সময় আমরা রাথোঙ্গ নদী পার হইলাম। নদীর উপরে ছোট ছোট তক্তা দিয়া তৈরি সেতু ছিল। নদী পার হইয়া আমরা পশ্চিম দিকে নেপাল সীমান্তের দিকে চলিলাম। পথের দুই দিকে রক্তদ্রোণ গাছের সারি। গাছগুলি ফুলে ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কিছু দূর যাইতেই বৃষ্টির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বেলা তিনটার সময় তিগিয়ালা নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এ-স্থানের উচ্চতা হইবে ১৪,৮০০ ফিট। এখানে ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে গিয়া

আশ্রয় লইলাম। এই গুহার মধ্যে আমাদের তিন জন তিব্বতীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বলিলেন, সিংবিয়ার নামক নেপালী গিরিপথে প্রবেশ করিবার পক্ষে আমাদের আর কোনও বাধার কারণ নাই। থানাদার বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে। এ-সংবাদে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম। গুহার ভিতরে বসিয়াও বাহিরের তীব্র বায়ুর গর্জ্জন, বৃষ্টি ও তুষারপাতের অবিশ্রান্ত শব্দ শুনিতেছিলাম। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের তীব্রতা গুহার মধ্যে বসিয়াও অনুভব করিতেছিলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে তরুলতা-গুল্মের কোনও চিহ্ন নাই। সারারাত্রি দারুণ অসুবিধার ভিতর দিয়া কাটাইতে হইল।

২০শে জুন। আজ খুব সকালে যাত্রা করিলাম। সকাল-বেলার নির্ম্মল আকাশ ও সূর্য্যের প্রসন্ন দীপ্তি চিত্ত পুলকিত করিয়াছিল। আমরা এইবার যে অধিত্যকা পাইলাম, তাহা সবুজ সুন্দর ঘাসে অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে রাথোঙ্গ নদীর প্রধান শাখাটি ছাড়িয়া গিরিশিখরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যখন কাঙ্গলা গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখন সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। আমার সঙ্গী লামা ও আমি সবুজ রঙের চশমা পরিলাম। আর আমাদের কুলি এবং পথপ্রদর্শক তাহাদের চোখের

কোণ কালো রঙে চিত্রিত করিল। খানিক দূর চলিয়া গায়ের গরম কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া কুলির হাতে দিলাম। আমার পথপ্রদর্শক অতি দ্রুত চলিতেছিল, আমিও তাহার সহিত সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাকে পথ-প্রদর্শক বারবার সতর্ক করিয়া দিতেছিল—সাবধানে পা ফেলিবেন, পা পিছলাইলে আর রক্ষা নাই, হাজার হাজার ফিট নীচের গভীর খাতে গিয়া পড়িতে হইবে।

এক মাইল পথ ক্রমাগত বরফের উপর দিয়া চলিতে হইল। সম্মুখে কতকগুলি স্তূপাকৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একটি নিশান উড়িতেছিল। পথ-প্রদর্শক বলিল উহা নেপাল ও সিকিমের সীমান্ত রেখা নির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তারপর আবার পথ চলা সুরু হইল। আবার প্রায় এক মাইল পথ তুষারাচ্ছন্ন পিচ্ছিল সঙ্কটময় পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। পাহাড়ের উপর হইতে বরফ গড়াইয়া পড়িতে-ছিল। এই ভীষণ সঙ্কটময় গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ইয়ামচু নামে পার্ব্বত্য নদী বহিয়া আসিয়াছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল—এই নদী অতিশয় বেগশালিনী, প্রতি বৎসর সেতু ভাঙ্গিয়া কত মানুষ ও পশ্বাদির যে মৃত্যু ঘটে তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। নদী বহিয়া চলিয়াছে কোন্ সে আদি যুগ হইতে তাহা কে বলিবে? বরফ-গলা অতি শীতল জলে পূর্ণা, বেগবতী এই

নদীকে ভয়ের চক্ষে দেখিলাম। এই প্রলয়ঙ্করী গিরি-নদীকে নেপালি ও ভুটিয়ারা পূজা করিয়া থাকে।

এই ভাবে চলিতে চলিতে আবার একটি অধিত্যকার দিকে অগ্রসর হইলাম। অবতরণ পথটি ছিল বড়ই বন্ধুর। পথপ্রদর্শক আমাকে হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিল। কুলিরা সকলে বিশ্রাম করিতে বসিল। কাঙ্গালাপর্ব্বতশ্রেণীর এই দিকের পাহাড়গুলি লাল বেলেপাথরে গঠিত। আমরা এখান হইতে আরও পাঁচ মাইল পথ চলিয়া একটি বিস্তৃত সমতল ভূমিতে আসিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। নানা শ্যামল তরুশ্রেণী এখানে শোভা পাইতেছে। সবুজ ঘাসে অধিত্যকাটি শোভাময়। এই মনোরম স্থানটির নাম কুর-পা-বা কার্পু। এখান হইতে কিছু দূরে ইয়ামপাঠসালে নামক একটি গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইলাম। এখানে দীর্ঘকায় বহু দেবদারু তরু শোভা পাইতেছিল। তা ছাড়া রোডোডেনড্রেন, জুনিপার, বার্চ এবং লার্চ জাতীয় তরুশ্রেণী চারিদিকে বিদ্যমান ছিল। সন্ধ্যার সময় আমরা একটি সরাইয়ে যাইয়া পৌঁছিলাম। লামা উগায়েনগিয়াৎসু এখানে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পথ-প্রদর্শক আমাদের খাওয়ার জন্য দু'টি ভাত রাঁধিয়াছিল। আর মাখন দিয়া চা তৈরি করিয়াছিল। সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর এইরূপ আহারে শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। আমরা

এখানে একদিন বিশ্রাম করিয়া পরের দিন অতি প্রত্যুষে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

২২শে জুন। আমরা ইয়ালুং নদী পার হইয়া একটি দুরারোহ চড়াইয়ে উঠিতে লাগিলাম। এই চড়াইটি প্রায় ২,৫০০ ফিট খাড়া হইবে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা পাহাড়ের উপর উঠিলাম। এই গিরিশৃঙ্গটির নাম চুঙ্গারমা। চুঙ্গারমা গিরিশৃঙ্গের উপর দুইটি ছোট ছোট হ্রদ আছে। বড়টির বেড় ৫০০ ফিটের বেশী হইবে না। ইয়ালুং নদী এবং মাতারাচু নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমাদের চারিটি অতি কঠিন চড়াই পার হইতে হইয়াছিল। উহার মধ্যে মির্কেন-লা, পাঙ্গোলা হইতেছে সব চেয়ে উচু। উহাদের উচ্চতা ১২,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফিটের কম হইবে না।

আমরা এই গিরিশৃঙ্গ কয়টি উত্তীর্ণ হইয়া একটি অতি সুন্দর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। ছোট একটি নদী গ্রামের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তিন দিকে পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রক্তদ্রোণ, জুনিপার, দেবদারু প্রভৃতি তরুশ্রেণীর গভীর বন গাঢ় শ্যামল শোভায় শোভা পাইতেছে। আমাদের পথপ্রদর্শক তাঁহার বন্ধু একজন স্থানীয় "সেরপা"র (নেপালি বা ভুটিয়া কৃষক) সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া

গেলেন। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ, লামা টুপি, এবং আমার আর্য্যজনোচিত আকৃতি দেখিয়া তাঁহারা আমাকে 'পাবু' বা নেপালি নামা বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলেন। আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছি, এ-সকল বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না করিয়া 'সোর-পা' আমাকে তাঁহাদের বাস-গৃহের মধ্যে চমরী গোরুর রোমে নির্ম্মিত অতি সুন্দর আসনখানিতে বসাইয়া অতি বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের লোকেরা আমাকে কৌতূহলভরে দেখিতে লাগিল। আমার নাম, জাতি, ভ্রমণের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কেহ একটি প্রশ্নও করিল না। সঙ্গীয় লামা উগায়েন-গিয়াৎস্নু তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আমাকে 'বাবু' বা 'লামা' নামে সম্বোধন না করিয়া 'পাবু লামা' নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

২৩শে জুন। এই গ্রামটির নাম গিয়ানস্নুর। এখানে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। কাম্বাচান্ নদীর দক্ষিণ তীরে তাসিচোডিং নামক মঠটি অবস্থিত। এই বিহারে ৮০ জন শ্রমণ বাস করেন। পূর্ব্ব নেপাল ও সিকিমের মধ্যে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ। এখানকার গ্রন্থশালায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী সযত্নে সংগৃহীত রহিয়াছে। লামাদের মাথায় বড় চুল, কানে দীর্ঘ কর্ণ-বলয়, কতকটা ভারতের আদি যুগের বৌদ্ধ শ্রমণদের মত। আমি এবং লামা উগায়েন-গিয়াৎস্নু দুইজনে একটি একটি করিয়া দুইটি টাকা মঠে প্রণামী

দিলাম। সন্ধ্যাবেলা প্রধান লামা আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন। গরম মাখন চা, প্রচুর সিদ্ধ গোল আলু, মূলা এবং শালগম ইত্যাদির ব্যঞ্জন খাইতে দিলেন। অনেক দিন পরে এ-সমুদয় প্রিয় খাদ্যদ্রব্যাদি পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। প্রধান লামা আমাদিগকে বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্ থাকিতে উপদেশ দিলেন। লামা উগায়েনগিয়াৎসু বলিলেন—"আমাদের হিমালয়ের এই অঞ্চল সম্পর্কে কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই। আপনি যদি আমাদিগকে সাহায্য করেন। তবে একান্ত বাধিত হইব।" প্রধান লামা আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁহার এই সদাশয়তার জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলাম। আমি লামার সহিত কথা বলিবার সময় নেপালী ভাষা এবং তিব্বতীয় ভাষা উভয় ভাষায়ই কথা বলিয়াছিলাম। লামা আমাকে 'পাবু লামা' বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। আমি অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে আমার নাম ধাম ইত্যাদির কোনও পরিচয় দেন নাই। যাঁহার যেমন মনে হইয়াছে তিনি আমাকে সেইরূপ ভাবিয়া লইয়াছেন।

২৪শে জুন। আজ গ্রামের লোকেরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ভেড়ার মাংস, রুটি, আলু সিদ্ধ, বিবিধ ব্যঞ্জন এবং উত্তেজক পানীয় 'মোরওয়া'ও আমাদের

দেওয়া হইয়াছিল। আমরা বৃত্তাকারে ভোজনে বসিয়াছিলাম। আমি চীনদেশের একটি সুশ্রী কম্বল দ্বারা সারা দেহ আবৃত করিয়া বেশ আরাম করিয়া বসিয়াছিলাম। আমি বড় একটা কথা বলি নাই। আমার হইয়া লামা উগায়েনগিয়াৎসুই উত্তর দিতেন। আমি শুধু মাঝে মাঝে—"লা-লা-সো, থুগ-জে-ছে," অর্থাৎ হাঁ—মশাই আপনাদের বিশেষ দয়া, এইরূপ দুই একটি কথা বলিয়াছি; লামা সব শেষে ভাত ও ভেড়ার মাংস আনিলেন। রান্না অতি উপাদেয় হইয়াছিল। আমরা প্রধান লামাকে দুইজনে পুনরায় দুইটি টাকা প্রণামীস্বরূপ দিয়া 'সেরপার' বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

২৫শে জুন। আজ তাসিচোডিং মঠের দ্বিতীয় লামা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকেও দুই জনে দুইটী টাকা নমস্কারি দিলাম। গ্রামের লোকেরা একটি সভা করিয়া আমাদের তিব্বত-যাত্রা-পথে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেজন্য সাহায্য করিতে মনোযোগী হইলেন। ফুরচঙ্গ নামে গিয়ানসুর মঠের একজন শ্রমণকে আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে দিলেন। এই লোকটি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও শক্তিশালী। আমাদের সঙ্গীয় আগের কুলিদের বিদায় দিয়া এখানে নূতন কুলি নিযুক্ত করা হইল। গিয়ানসুর গ্রামটি কাঙ্গচান্ নামক নদীর তীরে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস এই নদীটি কাঞ্চনঘঙ্ঘার নিম্নতম কোনও গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

পরদিন প্রত্যূষে বেলা সাতটার সময় গিয়ানস্থুর ছাড়িলাম। এবং কাঙ্গচান্ নদীর তীর ধরিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। সহজ সুন্দর পথ। প্রভাত-সূর্য্যের প্রসন্ন কিরণে চারিদিক সমুজ্জ্বল।

বেলা চারিটার সময় কাম্বাচেন্ বা কাঙ্গ-পো-চেন নামক একটি গ্রামে আসিলাম। এখানকার উচ্চতা প্রায় ১৩,৬০০ ফিট। গ্রামে প্রবেশ করিবার পথে নদীর স্রোতোজলে চালিত একটি যবের কল দেখিলাম। এখানকার সর্ব্বত্র যবের চাষ হইয়া থাকে। স্থানীয় বাড়ীঘরগুলি কাঠের তৈয়ারী। প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে কাঠগুলি আটকান হয়। জানালাগুলি খুবই ছোট। এজন্য ঘরের ভিতরে আলো বড় একটা প্রবেশ করে না। স্থানীয় লোকেরা অনেকটা সময় বাহিরেই কাটায়, ঘরে বড় একটা থাকে না। বাহিরে দরজার কাছে আগুন জ্বালাইয়া রাখে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গ-চান্ গিরিশৃঙ্গের উদ্দেশ্যে গিয়ানস্থুর এবং কাম্বাচান্ গ্রামবাসীদের পূজা ও উৎসব দেখিতে পাইয়াছিলাম। বন্দুক ছোড়া, কুস্তী-খেলা তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহা অনেকটা বিখ্যাত "ওলিম্পিক্" ক্রীড়ার ন্যায়। আমরাও ঐ সকল ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করিলাম এবং মল্লদিগকে সাধ্যানুরূপ পুরস্কৃত করিলাম।

সেদিন বিকেলবেলা আমরা একজন পত্র-বাহকের মারফৎ জানিতে পারিলাম যে তিব্বত-সীমান্তের রাজকর্ম্মচারী, কাংবা-

চীনের দিকে আসিতেছেন। কাজেই যেন কোন বণিক্‌কে বা পর্য্যটককে তিব্বতের পথে অগ্রসর হইতে না দেওয়া হয়। তিব্বতে যাইবার পথটি হইতেছে চেন্‌মোর গিরিপথ। ঐ চেন্‌মোর গিরিপথে যাইতেই নিষেধ করিয়াছেন। গিয়ানস্থুর গ্রামের মঠাধ্যক্ষ লামা আমাদিগকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে আমাদের পক্ষে উচিৎ হইবে অতি প্রত্যূষে অগ্রসর হওয়া। নচেৎ অগ্রসর হইবার পক্ষে বাধা পাওয়া স্বাভাবিক। গিয়ানস্থুর মঠের লামার এইরূপ বন্ধু-প্রীতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

২৬শে জুন। আমরা অল্প রাত্রি থাকিতেই কাংবাচান্ গ্রাম ছাড়িলাম। তাম্বুর নদীর বাম তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। পথটি ছিল বেশ ভাল এবং চড়াইও ছিল সহজ। আমরা যেমন উপরে উঠিতে লাগিলাম তেমনি দেখিতে পাইলাম দক্ষিণে 'কাঙ্গ চান্' গিরিশ্রেণী শোভা পাইতেছে, আর বামে তুষারমণ্ডিত কাঙ্গপাচান্ গিরিশৃঙ্গ অপূর্ব্ব শ্রীশোভিত। কাঙ্গপাচান্ হইতে তিন মাইল দূরে আমরা একটি জলপ্রপাতের কাছে আসিলাম। জলপ্রপাতটি অতি সুন্দর। এই প্রপাতের জল স্থানীয় অধিবাসীরা অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। তাহারা এই জলপ্রপাতের নাম দিয়াছে 'ক্ষান-হুম্-চু' বা পরীদের

জলপ্রপাত। এই প্রপাতের স্বচ্ছ শুভ্র সলিলরাশি ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নস্থিত শিলাখণ্ডে পতিত হইয়া এবং সূর্য্য কিরণে উল্লসিত হইয়া শত শত রামধনুর সৃষ্টি করিতেছিল। কথিত আছে ভারতের প্রধান অষ্ট ঋষি, এই প্রপাতের পবিত্র সলিলে * অবগাহন করিয়া ইহার জলের পবিত্রতার কথা প্রচার করেন। প্রপাতের তিনটি ধারা বজ্র নিনাদে শিলারাশি সমাকীর্ণ পর্ব্বত-নিম্নে পতিত হইয়া গিরিরন্ধ্র-পথে অদৃশ্য হইতেছে। আমরা প্রপাতের যে ধার দিয়া চলিলাম, সেখানকার প্রশস্ততা ১৮ ফিটের কম হইবে না। আর অনুমান প্রায় সহস্র ফিট উচ্চ হইতে সলিলধারা নিম্নে পতিত হইতেছে। যে বিরাট পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে এই জলপ্রপাতের উৎপত্তি, যে অবিন্যস্ত বন্ধুর শিলাস্তূপের মধ্য দিয়া ইহার অশ্রান্ত পতন ও যে বনরাজি সমাকীর্ণ শ্যামল পার্ব্বত্য অধিত্যকার মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কট পথে ইহার ভূপতিত জলধারার অবাধ গতি তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

আমাদের অদ্যকার যাত্রাপথটি ছিল পরম রমণীয় সবুজ তৃণ পরিশোভিত। শ্যামল অধিত্যকার মধ্য দিয়া পথ। পথের

*The eight Indian saints, called in Tibet Rig-zin-gye, and the famous Tang-song-gyupa, the Vyasa of the Buddhists, are said to have bathed in the water of this fall, and it is in consequence regarded as the holiest river in this part of the Himalayas. Journal of the Buddhis Text and Anthropological Society. Edited by Sarat Chandra Das, C.I.E., Vol. VII, 1899, Part I, page 11.

দুইধারে নানাজাতীয় পুষ্পের বর্ণ-সুষমা আমাদের চিত্তকে অপূর্ব্ব আনন্দে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরে রামথাং নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী প্রান্তের এক গোয়ালঘরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়া সামান্য জল-যোগ করিলাম। তারপর আবার পথ চলা সুরু হইল। অপরাহ্ণ ৫টার সময় আমরা জোরগু-ওগো নামক স্থানের একটি পার্ব্বত্য গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম। গুহাটি ৪ ফিট দীর্ঘ, ৩ ফিট চওড়া এবং ৩ ফিট উচু ছিল। এ-গুহার মালিক একটি পার্ব্বত্য শৃগাল—ওয়ামো বা ওয়া। বেচারা ওয়াকে গৃহহারা করিয়া আজ আমরা তাহার গুহায় অতিথি হইলাম। ওয়ার গায়ের লোম বেশ বড় হয় এবং তা বেশ চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। জোরগু-ওগোর উচ্চতা সমুদ্র তটরেখা হইতে প্রায় ১৮,৮০০ ফিট। ঐ সময়ে তাপমান ছিল ৩০° ডিগ্রী। আমি এখানে চা প্রস্তুত করিলাম। এবং কোনরূপে জনার খাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুধা দূর করিলাম। রাঁধিবার কাঠ কোথায় মিলিবে যে দুইটি ভাত রাঁধিয়া খাইব? রাত্রি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ঝটিকার তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছিলাম। সে শব্দের বিরাম ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতও আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতশ্রেণী, আকাশমণ্ডল, চতুর্দ্দিক তুষারময় হইয়া গেল। বাহিরে বাতাসের তীব্র গর্জ্জন ও তুষারপাতের শব্দ

শুনিতেছিলাম। লামা উগায়েনগিয়াৎসু এবং আমি কোন রকমে কম্বল মুড়ি দিয়া সেই শৃগালের গর্ত্তেই শুইয়া পড়িলাম। সঙ্গের কুলিরা বাহিরে উন্মুক্ত আকাশতলে আমার ওয়াটারপ্রুফ কাপড় এবং ছাতা কয়টির আশ্রয়ে অতিবাহিত করিল। গুহার মাঝখানটি ছিল অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, তাই সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিলে পর পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম।

২৭শে জুন। ঠিক প্রভাত নয়, উষার প্রথম আলোক-রেখা আকাশ প্রান্তে কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়ে আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। পথে কোথাও সামান্য তৃণ-গুল্ম বা উদ্ভিদের চিহ্ন নাই। উষার স্তিমিত আলোকে দেখিলাম, তখনও চারিদিক তুষারময় এবং তখনও তুষারপাত হইতেছিল। তুষার-কণাগুলি বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

দক্ষিণে ও বামে যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই দেখিতে পাইতেছিলাম—অদ্রিমালার শুভ্র অভ্রভেদী শৃঙ্গনিচয়, একটির পর একটি কোন্ অজানা দেশে গিয়া মিশিয়াছে। তুষার-ঝটিকার ক্ষণমাত্রও বিরাম নাই। আমরা সমুদ্রসমতা হইতে আনুমানিক ১৯,০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ মধ্যস্থ পথ ধরিয়া চলিতেছি।

পথ-প্রদর্শক বলিলেন, এখন আমরা চিরস্থায়ী তুষাররাশির শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমাদের দক্ষিণে ও বামে চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমারণ্য। এই তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথে আমরা

অতি কষ্টে ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পাইলাম, তুষারগিরিশ্রেণী উত্তর হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকা ভূমি তুষার-স্তূপে সমাবৃত। এ সকল তুষার স্তূপের কোনটিই পঞ্চাশ ফুটের কম নহে। আমার মনে হইল আমরা যেন তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া যাইতেছি. আর এই তুষার স্তূপসমূহ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। এই বিরাট তুষার-রাজ্যের তিন মাইল পথ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া অতিক্রম করিবার পর আমি ক্লান্ত ও শ্রান্তদেহে ভূমিতলে বসিয়া পড়িলাম। বায়ুমণ্ডলের লঘুতা বশতঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। আমরা এখন ১৯০০০ ফুটেরও কিছু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ ও দুরারোহ পথ অতিবাহনে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত তুষাররাশির ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যাইতেছিল, নেত্রপীড়া অনুভব করিতেছিলাম। আমি সবুজ বর্ণের চশমা পরিলাম, তবু অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিলাম। আমার জীবনে আমি এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় কোনদিন পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লামা উগায়েনগিয়াৎস্থুর স্থূল কলেবর, কাজেই তাঁহার অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি পথশ্রমে একান্ত কাতর হইয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িলেন আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তুষাররাশির উপর পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে লামা আমাদিগের পথপ্রদর্শক ফুরচঙ্গকে বলিলেন, যদি সে আমাকে কিছুদূর স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন। পুরস্কারের প্রত্যাশায় ফুরচঙ্গ আমাকে স্কন্ধে করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ পথ লইয়া গেল। তথায় বড় বেশী তুষার ছিল না। আমাকে নামাইয়া দিয়া ফুরচঙ্গ পুনরায় নীচে গিয়া মালপত্র সব লইয়া আসিল।

এইবার একটু আরাম বোধ করিলাম কিন্তু হিমালয়ের এই নিভৃত তুষারাবৃত শৃঙ্গের উপরত আর বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, তাই আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়ও আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিলাম না। কাছে এমন স্থান কোথাও নাই যে রাত্রির মত আশ্রয় লাভ করিতে পারি। জল নাই, গাছপালা নাই, লোকালয় নাই, পল্লী নাই, মানুষ নাই, কোথায় গিয়া আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইব, তাহাই হইল ভাবনার কথা।

এদিকে তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র শীতল বায়ু বেগে বহিতেছিল। তুষারাচ্ছন্ন ভূমিতলে মুক্ত আকাশতলে ত আর শুইয়া থাকা সম্ভবপর নহে। আমরা একান্ত শঙ্কাকুল চিত্তে চলিতে লাগিলাম। অন্ধকার হইয়াছে, শুধু তুষারের শুভ্র-

দীপ্তি-বিভাসিত ক্ষীণ আলোকে পথ দেখিয়া চলিতেছিলাম। রাত্রি সাতটার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড শিলাস্তূপের কাছে আসিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, রাত্রিতে এই প্রস্তর স্তূপের স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাত্রিতে তুষার গলিবে না। তবে আমাদের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এস্থান পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। আমরা বরফের উপরই কম্বল বিছাইয়া শয্যা রচনা করিলাম। কাল সারাদিন অনাহারে কাটাইয়াছি, তবু একেবারেই ক্ষুধা ছিল না। ক্লান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২৮শে জুন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা আরম্ভ করিলাম। দিগন্তবিস্তৃত তুষার-সমুদ্র। প্রস্তর স্তূপ, গাছপালা, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এক পা চলি, আবার বসিয়া পড়ি বা শুইয়া পড়ি। হাঁটু পর্য্যন্ত বরফাবৃত পথে বরফরাশি ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। পা দুইটি একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ অতি শোচনীয় শারীরিক অবস্থায়ও আমি প্রাণপণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিতেছিলাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া ফুরচঙ্গ আমাকে আবার কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। তাহাকে আমি আমার সবুজ চশমাটি পরিতে দিলাম। আর আমি অবসন্নভাবে চোখ বুজিয়া তাহার স্কন্ধদেশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এইভাবে প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া আমরা

জোন্-সাং-লা পর্ব্বতশৃঙ্গের পদতলে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে তুষার নয় ইঞ্চির বেশী গভীর ছিল না। আমি এইবার আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। ফুরচঙ্গ তাহার মালপত্র আনিবার জন্য আবার নীচে নামিয়া গেল। সূর্য্য এ-সময়ে পশ্চিম দিকের গিরিশ্রেণীর অন্তরালে পড়ায় আমাদের চলিতে একটু সুবিধা হইয়াছিল। চলিতে পা পিছলাইয়া পড়িতেছিল, তবু চলিতেছিলাম। আবার এদিকে খুব জোরে তুষার পাত হইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় ছয় ঘটিকার সময় আমরা একটি গুহা পাইলাম। গুহাটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বেশ বড়। খাড়াইও ৬ ফুটের কম নহে। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, —আমরা দুর্গম তুষার-গিরিপথ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের পথ সুগম ও সহজ হইবে। আমরা গুহার মধ্যে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। বরফের স্তূপের উপর বিছানা পাতিতে হইল। গুহার ছাতের ফাঁক দিয়া বিন্দু বিন্দু জলাকারে বরফ গলিয়া পড়িয়া ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। কাঠ কোথায়? আর কাঠ থাকিলেই বা কিভাবে আগুন জ্বালাইতাম! আমরা এইবার নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী দুরারোহ সুদুর্গম চাথাংলা নামক তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া জেমু নদীর মালভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি। চাথাংলা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম কালে যে কিরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও অনশনের যন্ত্রণা

সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা আমাদের লিখিত এই বিবরণী হইতেই সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চাথাংলা গিরি-বর্ত্মের উচ্চতা কোন কোন স্থানে সমুদ্র তটরেখা হইতে প্রায় ২০,০০০ ফিট উচ্চ হইবে।

২৯শে জুন। আজ প্রত্যূষে আমাদের উৎরাই বা নিম্নাবতরণ আরম্ভ হইল। প্রায় ছয় ঘণ্টা কাল দুর্গম গিরিসঙ্কট-পথে অবরোহণ করিতে করিতে আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তুষার স্তূপের মধ্যে কিছু কিছু সবুজ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত দুই একটি গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। বেলা এক ঘটিকার পর একটি পার্ব্বত্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়ামি-থো-থো নামক এক গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামটি একটি সুন্দর পার্ব্বত্য অধিত্যকায় অবস্থিত। নদীটির নামও গিয়ামি-থো-থো। ঐ নদীর পার হইয়া আমরা বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর জেমি নদীর তীরে আসিলাম। এই জেমি নদী কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর দিকের শৃঙ্গরাজির চরণতল ধৌত করিয়া ক্রমাগত নিম্নাবতরণ করিতে করিতে অবশেষে তিস্তা নদীর সহিত গিয়া মিলিত হইয়াছে। জেমি নদীর তীরবর্ত্তী উপত্যকায় একটি ঘাসের শীষও দেখা গেল না। নদীর তীর ধরিয়া আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইখানে কিছুদূর যাইবার পরই আমরা দেখিতে পাইলাম, অদূরস্থিত এক উপত্যকা ভূমিতে চমরী গাভী ও লম্বা লোমবিশিষ্ট

মেষ ও ছাগ চরিতেছে। আমাদের পথপ্রদর্শক এখানে আসিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। এই ডোক গিরিপথের রক্ষী প্রহরীর প্রতি আদেশ আছে যদি কেহ এই পথে তিব্বত সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত অগ্রসর হয়, তবে এখানকার রক্ষী প্রহরী ঐরূপ যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। এজন্য সরকার তাহাকে অপরাধী করিবে না। আমাদের এই পথের 'ছাড়পত্র' ছিল না। পথপ্রদর্শক ইহা বিশেষভাবে জানিয়াও আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। নিরুপায় আমরা, আমরা আর কি করিব তাড়াতাড়ি একটি গুহার মধ্যে গিয়া লুকাইলাম। সন্ধ্যার সময় অতি সংগোপনে বাহির হইয়া নদী পার হইলাম। জেমি নদীটি বেশ বড় এবং তিনটি স্রোতোধারায় বিভক্ত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। আমরা নদী পার হইয়া একটি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। সেদিন ছিল শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে দেখিতে পাইলাম দক্ষিণে ও বামে এক বিস্তৃত মালভূমি আর তাহার দুইদিকে দুইটি গিরিশ্রেণী বিরাজমান। ঐ মালভূমির উপর তুষার অতি অল্পই দেখা গেল। গিরিশ্রেণী তুষারাবৃত এবং বৃক্ষলতাহীন মরুর মত দেখা যাইতেছিল। আমরা মুক্ত গগনতলে মাটির উপরে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। উপরে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল নীল আকাশ, নিম্নে তুষারমৌলি অভ্রভেদি

গিরিশৃঙ্গ, দক্ষিণে ও বামে বিস্তৃত মালভূমি। আমাদের কিন্তু এইখানে গভীর নিদ্রা-সুখে রজনী অতিবাহিত হইল।

৩০শে জুন। সকালবেলা যাত্রা সুরু করিলাম। আমাদের পথ দুর্গম না হইলেও একেবারে সহজগম্যও ছিল না। তিন দিন অনশনে থাকার জন্য আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমাগত আট মাইল পথ চলিয়া আমরা নিরিমলা নামক চোরতেনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানকার বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইলাম। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। সবগুলিই তুষারাবৃত। এ-সমুদয় গিরিশ্রেণীর অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছিল দূরবর্ত্তী তিব্বতের বিস্তৃত মালভূমি ও নির্ম্মল নীল আকাশ। দূরে দূরে বিশাল তুষারক্ষেত্রের বিরাট দৃশ্যও দেখা যাইতেছিল। আমি ফুরচঙ্গকে সঙ্গে লইয়া তাহার সাহায্যে এখানকার সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর আরোহণ করিলাম। এখান হইতে আমার কল্পনারাজ্যের বাস্তব স্বপ্ন তিব্বতের উচ্চ মালভূমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিরভ্র নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে তিব্বতের মালভূমির বুকের গিরিশৃঙ্গসমুহ দেখা যাইতেছে। আমি যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম তাহার নাম লাপৎসা বা ওবো। উহার উপরে শিলাগঠিত একটি ‘স্তূপ’ ছিল। উহা ভারতীয় বৌদ্ধদের

কীর্ত্তিচিহ্ন। স্তূপের উপর নানা পতাকা উড়িতেছে। আমি এই স্তূপের সন্নিকটে ভক্তিভরে মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিলাম। লামা উগায়েনগিয়াৎস্থু একটি পতাকা খুঁটির সহিত বাঁধিয়া দিলেন। আমরা এই পবিত্র ভূমিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া তিব্বতের মালভূমির দিকে অবতরণ করিতে লাগিলাম। বেলা তিনটার সময় একটি হ্রদের তীরে আসিলাম। সূর্য্য ক্রমশঃ ভারতবর্ষের সীমান্তরেখায় অবতরণ করিতেছিল। তাহার রক্তিম জ্যোতিঃতে চারিদিকে লোহিতাভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হ্রদের স্বচ্ছ নীলাভ জলে প্রত্যেকটি পর্ব্বতশৃঙ্গ ও আকাশের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শুভ্র মেঘমালা প্রতিফলিত হইয়াছিল। হ্রদটি ডিম্বাকার—দৈর্ঘ্যে ১/৪ মাইল ও ২৫০ গজ প্রশস্ত হইবে। এই হ্রদ হইতে নিমানদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা হ্রদের তীরে বসিয়া চিনি সহযোগে ভুট্টা খাইয়া খানিকটা তৃপ্তি বোধ করিলাম। আবার আমাদের যাত্রা সুরু হইল।

পথের দুই দিকে মরুসদৃশ্য তৃণগুল্মবিহীন গিরিশ্রেণী। আমরা প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিয়া "সূর্য্যদেবের চৈত্য" (Chaitya of the Sun) নামক স্থানে আসিলাম। এখানে তীর্থ-যাত্রীদের ও লামাদের বিশ্রামের জন্য পাথরের দুই একটি বাড়ী আছে। এখানে অনেক খোদিত লিপিসম্বলিত স্তূপও দেখিলাম। এই চৈত্যটি ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণদের কীর্ত্তি। সেই কবে কোন্ আদি

যুগে বৌদ্ধ শ্রমণেরা এখানে আসিয়া এই চৈত্যটি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা ভারতীয়দের কীর্ত্তি-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তিব্বতের নানা প্রদেশ হইতে এবং চীন ও মোঙ্গোলিয়া হইতে প্রতি বৎসর এই পবিত্র স্থানে তীর্থ-যাত্রিগণের আগমন হইয়া থাকে। এখানে আমরা একজাতীয় গুল্ম দেখিলাম, তাহাতে অসংখ্য বেগুনি রংয়ের ফুল ফুটিয়া আছে। এই ফুলগুলির মৃদু মধুর সৌরভে চারিদিক সুরভিত করিয়াছিল। ফুরচঙ্গ আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া মঠের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মঠের মধ্যে লোকজন কেহই নাই। মঠ হইতে ফুরচঙ্গ কিছু কাঠ ও শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। ছয়টার সময় আমরা ১৭,০০০ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে রান্না চড়াইয়া দিলাম। এবং তিন দিনের ক্লান্তি ও অবসাদের পর পেট ভরিয়া অন্নাহার করিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করা গেল। যে পথে তোঙ্গরিজং ও কামবাজোংয়ের দুই দিকের পথের সহিত গিয়া মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। সোজা পথে চলিলে ধরা পড়িয়া বিপন্ন ও বন্দী হওয়ার আশঙ্কায়ই আমাদিগকে এই পথে যাইতে হইয়াছিল। আমরা যদি ধরা পড়িতাম, তাহা হইলে জাম্‌বাজোঙ্গে বন্দী-ভাবে থাকিতে হইত। আজ আবহাওয়া ছিল অতি চমৎকার। আকাশ ছিল মেঘ-

শূন্য উজ্জ্বল নীল। পথের দুইধারে একজাতীয় কণ্টকগুল্মে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছিল। তাহাদের সৌরভে পথটি সুরভিত হইয়াছিল। এই স্থানের বৃক্ষলতাদি সবই সুগন্ধময়। ইহাদের সুগন্ধে এই স্থান আমোদিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয় এ স্থানের নাম গন্ধমাদন হইয়াছে।

হিমালয়ের এই উত্তর দিকের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে নানাজাতীয় প্রস্তর ও খনিজ দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। অভ্র, স্ফটিক-শিলা, কৃষ্ণশিলা কত কি দেখিলাম, কিন্তু শ্লেট পাথর কোথাও দেখি নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা বহু গিরি, নদী উত্তীর্ণ হইয়া থিকোঙ্গ বা থিবোঙ্গ নামক একটি গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমরা এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে পরমানন্দ মনে মুক্ত আকাশতলে কম্বল জড়াইয়া সুনিদ্রায় রাত্রি কাটাইলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে শুভ্র-তুষার-মুকুট-পরিশোভিত অগণিত গিরিশৃঙ্গ শোভা পাইতেছিল। আর বাম দিকে থিবোঙ্গের নিকটবর্ত্তী গিরিশ্রেণী প্রহরীর মত দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখ ভাগে দেখিতেছিলাম দিগন্তপ্রসারিত মধ্যতিব্বতের গিরিশৃঙ্গরাজি।

১লা জুলাই। আজ অতি প্রত্যূষে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। পথে নিমা নদী দ্বিতীয় বার পার হইতে হইল। প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দূরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। আমাদের মনে হইল কোনও পর্য্যটকদল

আসিতেছে। একটু পরেই পথিকদের সহিত দেখা হইল। তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র চার জন। এই পথিকেরা সার নামক স্থানের দিকে যাইতেছে। আমাদিগকে এই যাত্রীদল নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? আমাদের দেশ কোথায়? কোথায় আমরা যাইব ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। ফুরচঙ্গ পথিকদের প্রশ্নের উত্তর দিল। তাঁহারা আমাকে একজন 'সারপা লামা' বলিয়া ধরিয়া লইল এবং তাহারা বলিল যে নেপালের পথে আমাকে দেখিয়াছে।

থিকোঙ্গ গ্রামটি—নিমা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গ্রামের নিম্নস্থ উপত্যকা তরুগুল্মহীন ঊষর মরুভূমির মত। গ্রামখানি প্রায় আট ফিট উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বাড়ী ঘরগুলির ছাত সমতল। পাথরের তৈয়ারী এবং প্রত্যেক ঘরের কোণেই মন্ত্র-তন্ত্র সম্বলিত কাগজ ও কাপড়ের টুকরা সংযুক্ত নিশান। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই ছোট এক একটি বাগান। বাগানে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য-কুসুম ফুটিয়া শোভা পাইতেছে। গ্রামের বাহিরের ক্ষেতে যবের চাষ হয়। নদীর মুখ হইতে খাল কাটিয়া আনিয়া ক্ষেতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। থিকোঙ্গ গ্রামের দূর পশ্চিমে সার, টিঙ্কিজোঙ্গ নামে কয়েকটি গ্রাম দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম দিকে সিকিমরাজ্যের তিব্বতীয় জমিদারী দোব্‌তা অবস্থিত।

চোমিতি-দোঙ্গ নামক হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দোব্তা নামে পরিচিত। চোমিতিদোঙ্গ হ্রদের জল সুমিষ্ট এবং এই জল মানুষ, পশু প্রভৃতি সকলে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে একটি ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হ্রদের তীরে তাশি-শে-পা নামক গ্রামে একজন ধনী তিব্বতীয়ের একটি চারিতল বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে চৌষট্টিটি জানালা রহিয়াছে। একদিন পশুপাল চরাইতে চরাইতে হ্রদের তীরস্থ এক নিভৃত স্থান হইতে সে বহু গুপ্তধন পাইয়া ধনশালী হইয়া উঠে এবং বৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকে।

চোমিতি হ্রদের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেখানে এখন এই বৃহৎ ও সুন্দর হ্রদটি বিদ্যমান, পূর্ব্বে ঐ স্থানে ছিল একটি সুমিষ্ট সলিল-ধারা-পূর্ণ উৎস। সেই প্রস্রবণের অধিকারিণী ছিলেন এক নাগকন্যা। মরুভূমির ন্যায় উষরক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত এই একটি মাত্র সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান থাকায় পথিকেরা, নিজেরা যেমন ইহার জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত, তেমনি পশ্বাদিরও এই প্রস্রবণই ছিল একমাত্র জল পানের অবলম্বন। একবার এক বণিক শতাধিক পশুপাল লইয়া এ স্থানে আসেন। তিনি প্রস্রবণের উৎক্ষিপ্ত ধারা হইতে জল সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু পরে উহা যথারীতি

পাথর দিয়া ঢাকা দিতে ভুলিয়া গেলেন। এদিকে সঙ্গীয় পশুপাল প্রস্রবণের জল পান করিয়া জল প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের খুরের দ্বারা আঘাত করিয়া যে সামান্য জল ছিল তাহাও কর্দ্দমাক্ত করিয়া পানের অযোগ্য করিল। নাগকন্যা তাহার প্রিয় প্রস্রবণের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ উৎসটিকে সমুদ্রে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। নাগকন্যার স্বামী ছিলেন ভারতীয় প্রধান বৌদ্ধ আচার্য্য ফা-দাম-পাই-সাঙ্গ (Pha-dam-Pai-sange)। তিনি এইরূপ কার্য্য হইতে পত্নীকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোনও সুফল হইল না। নাগকন্যা ক্ষুদ্র প্রস্রবণের সহিত সমুদ্রের সংযোগ সাধন করিলেন, তাহারই ফলে ক্ষুদ্র উৎস হইতে হইল এই সুবৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি।

আমরা যে ভারতীয় আচার্য্যের কথা বলিলাম, তিনি তোঙ্গরি-জঙ্গ মঠের প্রতিষ্ঠাতা। সেই মঠের মধ্যে আচার্য্যের ও তাঁহার পত্নী নাগকন্যার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ মঠে প্রবেশ করিয়া ইহাদের মূর্ত্তি দেখিতে হইলে তিব্বতীয় এক টঙ্কা (ভারতীয় ।৵০ আনার সমতুল্য) দক্ষিণা দিতে হয়। থিকোঙ্গে আমাদের ঘোড়া মিলিল না। এখন ঘোড়াতে যাওয়াই সুবিধাজনক। আমরা থিকোঙ্গ হইতে টাঙ্গ-লাঙ্গ নামক একটি গ্রামে আসিলাম। বেশ বড় গ্রাম। প্রায় ৩০০ শতটি বাড়ী আছে। ছোট একটি

নদী গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীর দুই পাশে যবের ক্ষেত। এখানকার চমরী গোরুগুলি দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনি সুস্থ ও সবল। মাঠে অনেক গাভী, ভেড়া ও ছাগল চরিতেছে। গ্রামে প্রবেশের পথে দুইটি বেশ উচ্চ চৈত্য দেখিলাম। গ্রামের মধ্যে একটি মঠে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। ফুরচঙ্গ আমাদিগকে তাহার পরিচিত এক গৃহস্থের বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ীর গৃহিণী আমাদিগকে চা এবং যবের তৈরি খাদ্য দিলেন। আমাদের রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটি ছোট ঘর দেওয়া হইল। ঘরটি ১০ ফিট দীর্ঘ এবং ৮ ফিট প্রশস্ত হইবে। ঘরের মেজে ধূলাবালিতে পূর্ণ ছিল। এক কোণে ছিল অগ্নি জ্বালিবার চুল্লি। আমি এই ধূলাবালিভরা নোংরা ঘরে থাকিতে পারিলাম না। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অন্য একটি ভাল ঘর দেওয়ায় আমরা নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমরা কেবলমাত্র বিছানা পাতিয়া একটু বিশ্রাম সুখ ভোগের আয়োজন করিতেছি, অমনি দলে দলে ভিক্ষুক আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল এবং গ্রামের কৌতূহলি দর্শকেরা আসিয়া আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাঁশী বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গানের মর্ম্ম হইতেছে—আমাদের যাত্রাপথ যেন শুভ হয়। আমি প্রত্যেককে চারি আনা করিয়া বকশিস দিয়া

বিদায় করিলাম। অবশেষে দর্শন দিলেন চান্‌কু। চান্‌কু হইতেছে তিব্বতের ক্ষুদ্রাকার চিত্র-ব্যাঘ্র। তিব্বতীয় ম্যাষ্টিফ বা ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুরেরই মত প্রায় দেখিতে। এই চান্‌কুটি বেশ পোষ মানিয়াছিল। তাহার মালিকের ইঙ্গিতে চান্‌কু আমাদের অনেকবার 'সেলাম' করিল। বাড়ীর কর্ত্তা চান্‌কুর মালিককে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। চিতা বাঘকে তিব্বতীয়েরা ঘৃণিত জীব বলিয়া মনে করে।

২রা জুলাই। আজ এখান হইতে তিনটি টাট্টু-ঘোড়া ভাড়া করিয়া রওয়ানা হইলাম। আমরা কাল যে গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম, তাহাকে জনপ্রতি এক টাকা ঘর ভাড়া দিয়া বিদায় হইলাম।

আমাদের পথে তুইটি নদী পড়িয়াছিল। নদী তুইটির পার দিয়া পথ থাকায় পথ চলিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। আমরা গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে টারগে নামক একটি গ্রামে আসিলাম। গ্রামের এক দিকে একটি বিহার আছে। বিহারটির নাম সাডিং গোম্পা। এখানে পথের ধারে যাত্রীদের থাকিবার জন্য একটি ধর্ম্মশালা আছে। এ-ধর্ম্মশালাটি বেশ বড়, ঘরগুলিও ভাল। কাজেই রাত্রিতে বেশ আরামেই কাটাইয়াছিলাম। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে কাম্বাজঙ্গ তুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্গটি এক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অবস্থিত।

৩রা জুলাই। অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। পথে একটি নদীর ধারে রান্না করিয়া খাওয়া দাওয়া সারিয়া মধ্যাহ্ন বেলা আবার যাত্রা সুরু করিলাম এবং বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় ডোক্‌পা নামক একটি সহরে আসিলাম। এখানে প্রায় ৬০০ শতটি পরিবার আছে। ইহারা চাষ বাস করিয়া জীবনধারণ করে। প্রত্যেকটি বাড়ীর চারিদিকে মাটির বা পাথরের দেওয়াল। ঘরগুলি পাথরের বা কাঁচা ইটের তৈয়ারী। এখানে গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। ফুরচঙ্গ তাহার ঘোড়া হইতে নামিয়া হাতে একটা ধারালো লম্বা খুরকি ও লাঠি লইয়া সহরের দিকে চলিল, কিছু ভেড়ার মাংস সংগ্রহ করিয়া আনিতে। তাহাকে দেখিয়া তিব্বতীয় ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুরগুলি ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ফুরচঙ্গ তাহার লাঠি দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। আমরা এ সহরের লোকদের নিকট শুনিলাম যে আমাদের গন্তব্য পথে দস্যু—ডাকাতের ভয় আছে। সেইজন্য আমি আমার পিস্তলে গুলি ভরিয়া লইলাম, লামা তাহার তরবারি কোমরে ঝুলাইলেন এবং পিস্তলও ঠিক্ করিয়া লইলেন।

বেলা তিনটার সময় আমাদের উৎরাই আরম্ভ হইল। একটি সমতলক্ষেত্রে আসিলাম। ঊষর সমতল প্রান্তরের উত্তর-

পূর্ব্ব দিকে দিগন্ত বিস্তারিত তুষারমৌলি গিরিশ্রেণী। এই উষর সমতল ক্ষেত্রটি তিন মাইল প্রশস্ত এবং দৈর্ঘ্য কত তাহা বলা সুকঠিন। আমরা এই প্রান্তরের অর্দ্ধেকটা পথ মাত্র আসিয়াছি, এমন সময় ভীষণ ঝড় আসিল। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জনে, বজ্র-নির্ঘোষে ও বিদ্যুৎস্ফুরণে আমরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার গাত্রবস্ত্র সমুদয় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। তবু ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে লুক্রি নামক একটি গ্রামে আসিলাম। গ্রামের বাহিরে একটি গোয়ালঘর ছিল সেখানেই আশ্রয় লইলাম। গ্রাম্য রাখালদেরও ফিরিবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঘরের মেজে যে শুষ্ক গোময় সাজানো ছিল, তাহার উপরেই বিছানা পাতিলাম এবং রান্না-বান্না করিয়া পরম পরিতোষসহকারে ভোজন করিলাম।

বেলা পাঁচটার সময় রাখাল তাহার পালের প্রায় ৫০০ শত ভেড়া লইয়া আসিল। সঙ্গীয় কুলিরা তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলে পর সে আমাদিগকে কোনরূপ বিরক্ত না করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। আগের দিন রাত্রিতে দস্যুরা তাহার পালের অনেক ভেড়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পরে একদল তিব্বতীয় মহাজন আমাদের ঘরের প্রায় আশী হাত দূরে তাঁবু ফেলিলেন। সন্ধ্যার সময় স্যাদালিঙ্গ-পা নামক

একজন তিব্বতীয়ের নানা গল্প ও হাস্য-কৌতুকাভিনয় দেখিয়া পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

৫ই জুলাই। আজ আমরা দূর হইতে তিব্বতের বিখ্যাত রিগোম্পা বিহার দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঐ মঠে প্রায় ৩০০ শত লামা বাস করেন। মঠের অনতিদূরে তামার নামে একটি সহর আছে। ঐ সহরে অনেকগুলি চৈত্য রহিয়াছে। বেলা চারিটার সময় আমরা নাম-বু-ডঙ্গলা গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। তখনও বরফ পড়া থামে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিরিপথ উত্তীর্ণ হইয়া একটি নদীর পারে আসিলাম। এ-স্থানের উচ্চতা সমুদ্রতটসমতা হইতে ১৩,৫০০ ফিট হইবে। রাত্রিতে ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল। আর সারা রাত্রি হিমকণা বর্ষণ করিতে করিতে বাতাস গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছিল।

৬ই জুলাই। অতি প্রত্যূষে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। লা গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎরাই বড় কঠিন ছিল। আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা লা-জঙ্গ নামক একটি গ্রামে আসিলাম। টারগি-চূবা চূথা-চু নামক নদীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত। আমরা অন্যান্য যাত্রীদলের সহিত এই গ্রামে রাত্রি কাটাইলাম।

৭ই জুলাই। সকালে উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। আমরা পথে মঠের পর মঠ এবং অনেক লামা ও জিলঙ্গ বা

সন্ন্যাসীর দেখা পাইলাম। তাহারা উজ্জ্বল মূল্যবান পোষাক পরিয়া পথ চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ঘোড়ায় চড়িয়াছিল। বেলা সাতটার সময় গয়ালা পর্ব্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি আসিলাম। এখান হইতে যে বিস্তৃত সমতল ভূমি দেখা যাইতেছিল, তাহারই শেষ প্রান্তে তাসিলুমপোর বিহার অবস্থিত। এখান হইতে পশ্চিম দিকে নার্থাঙ্গ বিহার দেখা যাইতেছিল। নীল পর্ব্বতশ্রেণীর প্রান্তভাগে নার্থাঙ্গ মঠের শ্বেত প্রাচীর ও স্তম্ভ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। আমাদের পদতলবাহিনী পিনাম-নিয়াঙ্গ-চু নদীর রজতশুভ্র-সলিল-ধারা সূর্য্য কিরণে ঝলসিত হইতেছিল। ক্রমে আমরা উচ্চ গিরিপথ হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম। এখান হইতে তাশিলুনপো মঠের দৃশ্য অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছিল। এই স্থানে মঠের প্রধান লামা-পানচাঙ্গ-রিন্‌পো-চির বাসস্থান। তাশিলুনপো শব্দের অর্থ হইতেছে "পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ।" দূর হইতে মনে হইতেছিল তাশিলুনপো যেন একটি সুবর্ণগিরি।

আমরা অশ্বারোহণে মনের আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং দিলি নামক গ্রামে আসিলাম। দিলি তাশিলুন-পোর নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে প্রায় ৩০০টি বাড়ী আছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী। আমরা এই গ্রামের ইয়াঙ্গচানপুটি নামক একজন ভদ্রমহিলার বাড়ীতে

প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলাম। তাঁহার স্বামী অতি সজ্জন ও অতিথি-বৎসল, তিনি আমাদিগকে সুমিষ্ট ভাষণে স্বাগত করিলেন এবং বিবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। আমরা তাঁহাদের পতি ও পত্নীর সদয় ব্যবহারের জন্য বিদায় কালে সাদর সম্ভাষণ জানাইলাম। তাঁহারা আমাদের রওয়না হইবার সময় পুনরায় চা পান করাইয়া তবে বিদায় দিলেন।

আমাদের তাশিলুনপোর পথে অনেক লামা, অনেক বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছে অসংখ্য চমরী গোরু এবং গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে বোঝাই নানা মালপত্র।

অতি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া অবশেষে আমাদের অভীপ্সিত সুবর্ণবিহার দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমাদের দুর্গম পথযাত্রা শেষ হইল। বিধাতা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

মোল্লা আতা মুহম্মদ

সিন্ধু নদের উৎস-সন্ধানে

[মোল্লা আতা মুহম্মদ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদের উৎস সন্ধানে যাত্রা করেন। তিনি কান্দিয়া গিরি অধিত্যকা পথ অনুসরণ করিয়া সোয়াত হইতে উপগিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। ইনি 'মোল্লা' নামে পরিচিত ছিলেন। মোল্লা আতা মুহম্মদের সিন্ধু অভিযান তাঁহার সাহসী অধ্যবসায় এবং অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচায়ক।]

আমি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ার হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে আসিলাম। এই স্থানের নাম আবাজাই! ওখানে আমার একজন পরিচিত বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিলাম। আমার বন্ধুর একজন আত্মীয় পরদিন মিস্‌নি নামক একটি পল্লী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমি সেখান হইতে কাবুল নদীর তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া লালপুরার দিকে চলিলাম। মিস্‌নিতে আমি দুই চারিজন লোক সঙ্গীরূপে পাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পাইলাম না। তাহারা আমার নির্দ্দিষ্ট পথের কথা শুনিয়া বলিল যে ঐ পথে সোয়াতের দিকে যাওয়া সম্ভবপর নহে। কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐরূপ দুর্গম গিরিপথে আমার যাইবার উদ্দেশ্য কি? আমি তাহাদিগকে

বলিলাম যে আমি একজন কাঠের ব্যবসায়ী। পেশোয়ারে আমার মালিক থাকেন, তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ঐ দিকে যাইতেছি। নদীর উপর দিক হইতে কিভাবে কাঠ চালানি হইতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আমার যাত্রা। যে সকল মাঝিরা নদীর উপর দিক হইতে কাঠের ভেলা ভাসাইয়া আনে তাহাদের একজন আমার মালিককে চিনিত সে বলিল, এখন আপনার পক্ষে ঐ দিকে যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। বরফের চাপে পথ আট্‌কা পড়িয়াছে। লামুতি গিরিবর্ত্ম দিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু সে পথ বরফে অবরুদ্ধ, কাজেই নিরাশ-চিত্তে আমাকে পেশোয়ার ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় যাত্রার জন্য জুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

১১ই জুন। আমি পুনরায় পেশোয়ার ছাড়িলাম। তোতাই নামক গ্রামের একজন সৈয়দ আমার পথপ্রদর্শক হইলেন। তিনি আমাকে সোয়াত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। সোয়াত জেলার লেেকেরা সৈয়দদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। কাজেই একজন সৈয়দকে আমার পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়া আমার ভরসা হইল যে দস্যু-ডাকাতের হাতে পড়িয়া অযথা প্রাণনাশ হইবে না।

আমরা ১৩ই জুন আবাজাই ছাড়িয়া সোয়াত নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে পড়িল জিন্দি

বা লুন্দি নামে একটি নদী। কয়েক মাইল পথ হাঁটিয়া আমরা সোয়াত এবং সিন্ধু নদের একটি সঙ্গম স্থানে আসিলাম। এখানে নদী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। নদীর দুই ধারে দুর্গম শিলাকীর্ণ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। এজন্য এপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্য একটি সহজ পথ ধরিয়া কোজাতোতাই নামক একটি পার্ব্বত্য পল্লীতে আসিলাম। এখানে প্রায় ১,০০০ হাজার ঘর আছে। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা এই পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। গ্রামে যে বাড়ী অতিথি হইলাম, সে বাড়ীর লোকেরা সৈয়দ সাহেবের জন্য একখানি 'চারপাই' আনিয়া দিল। আমিও সেই চারপাইয়ের উপর সৈয়দ সাহেবের সহিত একসঙ্গে বসিয়া ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে বাড়ীর লোকেরা যে বিরক্ত হইয়াছিল তাহা তাহাদের ব্যবহার দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সৈয়দ সাহেব তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে আমিও একজন সৈয়দ, তখন আর তাঁহারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিল না।

১৪ই জুন। আজ সকালে কোট ছাড়িলাম। পথ বেশ ভাল। মালবোঝাই টাট্টু ঘোড়াও দিব্যি চলিতেছিল। দুই মাইল সমতল পথে চলিবার পর চড়াই পাইলাম। এই গিরিশৃঙ্গটি উত্তীর্ণ হইবার পর দেখিতে পাইলাম বাম দিক দিয়া সোয়াত নদী বহিয়া যাইতেছে। আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছিলাম,

সেস্থান হইতে নদীর দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল হইবে। যখন আমরা নদীর কাছে আসিলাম, তখন নদীর অপর তীরে আক্সগড় নামে একটি গ্রাম দেখা গেল। ঐ গ্রামে আসিল নামক এক হুর্দ্দান্ত জাতীয় লোক বাস করে। রাত্রিতে আমরা নরঞ্জা নামক গ্রামে ছিলাম। ইহা তোতাই পরগণার অন্তর্ভূ‍ক্ত।

১৫ই জুন। আজ প্রত্যূষে ইস্‌সার নামক গ্রামে আসিলাম। সোয়াত-নদী-বিধৌত এই প্রদেশের গিরিপথে 'চড়াই' ও উৎরাই খুব বেশী। এই পথে চলিতে চলিতে আমরা অনেক গ্রাম পার হইলাম। এ-অঞ্চলের প্রস্তরাকীর্ণ মাঠে ফসল অতি অল্পই জন্মে। প্রধান শস্য হইতেছে যব। এখানকার লোকেরা ছোটখাট ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। সাধারণতঃ পেশোয়ার জেলার নানা স্থানে কাঠ ও কয়লার ব্যবসায়ই হইতেছে প্রধান। ইহাদের আর একটি ব্যবসায় হইতেছে দস্যুবৃত্তি।

১৬ই জুন। আমরা ইস্‌সার গ্রাম হইতে রওয়ানা হইয়া মাৎ কানাই নামক স্থানে চামড়ার ভেলায় করিয়া সোয়াত নদী পার হইলাম। এইসব ভেলাকে স্থানীয় লোকেরা 'জলা' বলে। আমরা যখন সোয়াত নদী পার হইবার জন্য খেয়াঘাটে অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন নৌকার একজন মাঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাড়ী কি পেশোয়ার?' আমি বলিলাম 'হাঁ।'

তখন সে কহিল, 'আপনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, কয়েক বৎসর আগে ঠিক্ ঐ স্থানে একজন পেশোয়ারীকে তাহার সঙ্গীয় লোক খুন করিয়াছিল।' মাঝি বলিল,—আমরা তখন নদীর অন্য পারে ছিলাম। পেশোয়ারী ভদ্রলোক নদীর জলে হাত মুখ ধুইয়া যখন নামাজ পড়িবার আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময় তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে গুলি করিয়াছিল। সেই পেশোয়ারী ভদ্রলোক বেশ শক্তিশালী ছিলেন, তিনি একটি গুলি খাইয়াও আততায়ীকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু সেই লোকটি পর পর ছয়টি গুলি করিল। একটি গুলি পেশোয়ারী ভদ্রলোকের বুকের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার মৃতদেহ নদীর জলে পড়িয়া গেল। হত্যাকারীকে পাশের গ্রামের লোকেরা আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এবং তাহাকে বিচারের জন্য নিকটবর্ত্তী জেলার সদরে পাঠান হয়। নিহত পেশোয়ারী ভদ্রলোক আর কেহই নহেন, তিনি আমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সিন্ধু-অভিযানে আসিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন।

১৭ই জুন। কুজ বাদওয়ান্ ছাড়িয়া শামিলাই গিরিবর্ত্মের নিকট আসিলাম এবং সোয়াত পার হইয়া উচ্ নামক একটি সমৃদ্ধ পল্লীতে পৌঁছিলাম। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে পল্লী। চারিদিকে সবুজ শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্ররাজি। নিকটে বা দূরে কোথাও বন-জঙ্গল নাই। এখানে প্রচুর ধান জন্মে। গ্রামের অধিবাসীরা

সকলেই পাঠান। মোট কথা সোয়াত-বিধৌত প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাঠান-পল্লী। এদেশের বিধি-ব্যবস্থা বড় কঠিন। যদি কেহ চুরির দায়ে ধরা পড়ে তবে বাড়ীর মালিক তাহাকে হত্যা করিতে পারে। যেখানে ধরা পড়িবে সেখানেই তাহাকে মারিলে গৃহস্বামী অপরাধী হইবেন না। কিন্তু চোর যদি পলাইয়া অন্য গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে তবে তাহার উপর এ বিধান খাটিবে না। হত্যাকারী ব্যক্তির পক্ষেও এ বিধান প্রযোজ্য। অপরাধ করিয়া অপরাধী গ্রামান্তরে যাইতে পারিলেই সে নিরাপদ হইতে পারে।

এখানকার প্রধান খাদ্য ভাত। ধান ছাড়া এখানে ভূট্টা, গোধূম ও নানা প্রকারের ডাল জন্মে। তেল স্থানীয় লোকেরা ঘানির সাহায্যে উৎপন্ন করিয়া থাকে। লবণ দুষ্প্রাপ্য, উহা পেশোয়ার হইতে আসে। পেশোয়ার হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই লবণের মূল্য অতি বেশী। চিনিও পেশোয়ার হইতে নীত হয়। বর্ত্তমান সময় কোন কোন স্থানে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখিলাম। জীব-জন্তুর মধ্যে ঘোড়া এখানে খুবই পাওয়া যায়। তবে ঘোড়াও পেশোয়ার হইতে বণিকেরা আনিয়া কেনা বেচা করে। ভেড়া, ছাগল, গোরু, মহিষ, কুক্কুট এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিলাম। সোয়াত নদী এবং তাহার শাখাপ্রশাখায় ও অন্যান্য পার্ব্বত্য নদী-নির্ঝরিণীতে নানাজাতীয়

মৎস্য পাওয়া যায়। এখানে এক জাতীয় লাল রঙের বৃহদাকার মৎস্য অত্যন্ত সুস্বাদু। ঐ মাছের এক একটির ওজন আধ মণেরও বেশী হইয়া থাকে। এ জাতীয় মৎস্য নদীর স্রোতো-জলের বিপরীত দিকে যাইতে থাকে। সে সময়ে সুযোগ বুঝিয়া কৌশলী পাঠানেরা এই মাছ ধরে।

এ-স্থানের অধিবাসীরা তেমন বলিষ্ঠ নহে। বোধ হয় ভাত খায় বলিয়াই তাহারা দুর্ব্বল।

এই অধিত্যকা প্রদেশে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন আছে। ব্রিটিশের মুদ্রা পূর্ব্বে এপ্রদেশে চলিত না, সম্প্রতি ইহার চল হইয়াছে। মহম্মদশাহী এবং গুণ্ডা মুদ্রার প্রচলনই এখানে বেশী।

এদিকের প্রত্যেক গ্রামেই কতকটা নিষ্কর জমি একদল দরিদ্র আফগান ভোগ করে। তাহাদিগকে মালাতার বলে। এই পাঠানেরা যেমন গ্রামবাসীদের নিকট হইতে নিষ্কর জমি ভোগ করে; তেমনি তাহাদিগকে অন্য গ্রামের বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ হইতে এবং দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য রক্ষিবাহিনীরূপে কাজ করিতে হয়।

উচুদাড়া নামক গ্রামে সে সময়ে রহমৎউল্লা খান নামে একজন সর্দ্দারকে দেখিয়াছিলাম। তিনি প্রায় কুড়ি পঁচিশটি গ্রামের সর্দ্দার ছিলেন। প্রত্যেক গ্রামের লোকদের ঘর পিছে তাঁহাকে এক টাকা বাৎসরিক হিসাবে জমা দিতে হইত। কিন্তু জমি-জমার

উপর তাহাদের কোনও খাজনা দিতে হইত না। গ্রামের সমুদয় বিষয়ের গোলযোগ বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা তিনি করিয়া দিতেন। গ্রামের লোকদের উপর তাঁহার এই প্রভাব রহমৎউল্লা খাঁ নিজেই বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার দলে অনেক লোক ছিল।

১৯শে জুন। আজ আমরা গ্যারিদাগি নামক পল্লীতে আসিলাম। একটি স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্রপরিসরা নদীর উপরে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের বাম দিকে গিরিশ্রেণী শোভা পাইতেছিল। পর্ব্বতের নিম্নভাগ নানাজাতীয় কণ্টকগুল্মে আচ্ছাদিত ছিল। ঐ গুল্মগুলির উচ্চতা কোনটিরই ছয় ফিটের কম ছিলনা। ঐ গুল্মের মধ্যে এক প্রকার ফল জন্মে। স্থানীয় লোকদের নিকট ঐফল অত্যন্ত প্রিয়। গুল্মের নানারূপ রোগ আরোগ্যেরও ক্ষমতা আছে।

গ্যারিদাগি হইতে আমরা হাজারার দিকে রওনা হইলাম। নিকৃপিখেল নামক অধিত্যকা প্রদেশ উত্তীর্ণ হইয়া সারসিনাই নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে একদিন থাকিতে হইল।

২২শে জুন। আজ এ গ্রাম হইতে অন্য পথ ধরিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে চলিলাম। এসময়ে ঐ গ্রামের লোকদের পরস্পরের মধ্যে নানা অশান্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছিল।

কাজেই আমাদের পক্ষে ঐ গ্রামে থাকিয়া অনাবশ্যকভাবে জীবন বিপন্ন করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

২৩শে জুন। আজ কারারাই নামক একটি গ্রামে আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। এই গ্রামটি শিবুজনী পর্ব্বতের অধিত্যকা দেশে অবস্থিত। সারসিনাই গ্রামবাসী খান সৈয়দ আহম্মদ শাহা নানক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কয়েক বৎসর আগে আপনাকে শিবুজনী অধিত্যকা প্রদেশের নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উৎপন্ন শস্যের দশম ভাগের এক ভাগ রাজস্ব স্বরূপ আদায় করিতে থাকেন এবং গৃহপালিত পশুর উপরও একটা কর ধার্য্য করেন। এইরূপ করের নাম 'উষার'। উষার আরবী শব্দ, উহার অর্থ 'ঈশ্বরবৃত্তি'। এই করকে কর না বলিয়া জনসাধারণের স্বেচ্ছা-কৃত দান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা এইভাবে সংগৃহীত শস্য ও অর্থ গরীব দুঃখী ও অসমর্থ. পঙ্গু ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরিত হইত।

খান সৈয়দ আহম্মদ সাহেবের মৃত্যুর পর নিকটবর্ত্তী গ্রাম-বাসীরা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার পুত্রকে 'আখুন্দ' বা নবাব করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে আমি একজন ফকির মাত্র এবং আমার পুত্রও একজন ফকিরই হইবে। আমি ধন-সম্পদ এবং মান—প্রতিপত্তি দিয়া কি করিব? কাজেই গ্রামের প্রধানেরাই গ্রাম্য শাসন-সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সৈয়দ আহম্মদ শাহা শিবুজনিরই অধিবাসী ছিলেন।

২৪শে জুন। আজ আমরা শিবুজনি অধিত্যকার চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম এ-অঞ্চলের এক গ্রামের লোকের সহিত অন্য গ্রামের লোকের কোনও প্রীতির ভাব নাই, এক গ্রামের লোক অন্য গ্রাম আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিবার জন্য ব্যগ্র। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই-রূপ মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে। তবু আমি সাহস সহকারে উপত্যকার চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিলাম।

২৫শে জুন। দুরুশখেলা নামক একটি গ্রামের কাছে চামড়ার ভেলায় সোয়াত নদী পার হইয়া বাশিন নামক গ্রামে আসিলাম। সেখানে বিশ্রাম না করিয়া চুরাই নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। সোয়াত নদী-বিধৌত উপত্যকা ভূমির প্রান্তদেশে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামখানি যে অধিত্যকা প্রদেশে অবস্থিত তাহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় সমান। তিন চার মাইল পরিমিত হইবে। কোথাও কোথাও চওড়া একটু কমও হইতে পারে। দুই দিকে শ্যামল বনানী পরিবৃত পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি খুব উচ্চ নহে। ঐ সকল পর্ব্বতশ্রেণীর অধিত্যকা প্রদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর এবং ঐ সব স্থানে আঙ্গুর, বাদাম, এই সব নানা ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চুরাইর দুই মাইল দূরে সোয়াত-বিধৌত প্রদেশের ও কোহিস্থানের সীমা। এ-অঞ্চলে দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে—একটির নাম থানা, অপরটির নাম মিঙ্গ্‌রাউরা।

এই দুই গ্রামেই দুইটি বেশ বড় বাজার আছে। অনেক বাণিয়ার দোকান দেখিলাম। তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতবাসী। কাহারও বাড়ী উত্তর-পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে, কেহ বা পাঞ্জাবের অধিবাসী। পাঞ্জাবী বাণিয়ার সংখ্যাই বেশী। ইহাদের মধ্যে অনেকে ফলের কারবার করেন, কেহবা মহাজনী করেন, কাহারও কাপড়ের দোকান, মুদির দোকান, কেহ বা নানারূপ 'বেশাতি' লইয়া কেনা বেচা করেন। লোহার কামারের এবং স্বর্ণকারের দোকানও আছে। এই দুই গ্রামেই বহু হিন্দু ব্যবসায়ী বাস করেন। তাঁহাদের সাজ-সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ এদেশবাসীর অনুরূপ হইলেও তাঁহাদের সামাজিক রীতি নীতি, জাতি বিচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি ভারতের অনুরূপই রহিয়াছে।

২৭শে জুন। আজ আমি সোয়াত-নদী-বিধৌত প্রদেশ ছাড়িয়া কোহিস্থানের অন্তর্ভূ'ত চাম নামক গ্রামে পদার্পণ করিলাম। দারালদারা নামক স্থানে একটি সেতু পার হইয়া নদীর দক্ষিণ পারে আসিলাম। এই পার্ব্বত্য নদীটির গতি-বেগ দুই দিকের পর্ব্বতশ্রেণী ও বিরাটাকার শিলাস্তূপ দ্বারা প্রতিহত হইয়া এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে যে অনায়াসে লাফ দিয়া এক পার হইতে অন্য পারে যাওয়া যাইতে পারে। চাম আসিবার পথটি একেবারেই নিরাপদ ছিল না। দুইদিকে গভীর বন। বনের দুই দিকে মাঝে মাঝে দুই একটী ক্ষুদ্র পল্লী।

চাম গ্রামের পাশে আসিয়া আমি এক দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নদী পার হইয়া একটি তরুচ্ছায়া-সম্পন্ন তৃণাচ্ছাদিত মনোরম স্থান দেখিলাম। কয়েকটি শাখা-পত্রবহুল বড় বড় গাছ। নীচে সবুজ গালিচার মত সমতল ভূমি। আমার ঐ স্থানে গিয়া একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখিলাম, প্রায় ছয়জন লোক সেই তরুশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহারা আমাদের দেখিয়া সকলে একসঙ্গে ঐ স্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব আসিল। আমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন লোকগুলি আমার সঙ্গীয় ভৃত্যদের কাছে আসিয়া কহিল,—"তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, তোমাদের বিশ্রামের দরকার। আমরা তোমাদের গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত মালপত্র লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া আমার সঙ্গীয় ভৃত্য দুই জনের নিকট হইতে মালপত্র কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। আমি দেখিলাম যে লোকগুলো বড়ই বাড়া-বাড়ি করিতেছে, তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম,—"সাবধান, তোমরা যদি এইভাবে আমাদের বিরক্ত কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে গুলি করিয়া মারিব। কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিলাম।

লোকগুলি সংখ্যায় বেশী হইলেও আমি বিন্দুমাত্রও ভীত হইলাম না, কেননা আমি সশস্ত্র ছিলাম। সঙ্গে ছিল মাত্র তুইজন ভৃত্য। তবু আমার এইরূপ নির্ভীকভাব এবং সাহস দেখিয়া তাহারা আর কোনও গোলযোগ করিল না। আমরাও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খানিক দূরে গিয়া দেখি তাহারা পাহাড়ের কোন সোজা পথ ধরিয়া আসিয়া আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু ঐ লোকগুলি এইবার একটি কথাও না বলিয়া আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমাদের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হইবে না, বরং মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

২৮শে জুন। আজ গুজারবান্দা নামক একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করিলাম। গ্রামখানিতে ছয় সাতটি মাত্র ঘর। নদীর পার দিয়া পথ। এই নদীকে স্থানীয় লোকেরা বলে কোহিস্থানের নদী। কোহিস্থানের প্রবেশের পথটি বড়ই সঙ্কীর্ণ। তুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতের গায়ে চীর, দেবদারু, ওক্ প্রভৃতি গাছ। এখানে 'রয়াল পাইন' নামক গাছ অনেক। গাছগুলি শাখাপ্রশাখায় বহু দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া শোভা পাইতেছে। এ গাছ কাঠের দিক্ দিয়া অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ওক্ গাছের পাতা এখানকার গোরু, ছাগল ও ভেড়া প্রভৃতির অতি প্রিয় খাদ্য। এই গাছের কাঠও

ইন্ধনের পক্ষে খুবই ভাল। এদিকে রোডোডেনড্রোন গাছ বড় একটা দেখিতে পাইলাম না। চুরারাই হইতে ছয় মাইল দূরে বারনিয়াল নামক একটি গ্রামের কাছে সোয়াত নদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে। এক শাখা গিয়াছে কালাম নামক গ্রামের দিকে, অপরটি গিয়াছে দারাল অধিত্যকার দিকে। দারাল গ্রাম ঘৃতের জন্য বিখ্যাত। ঐ স্থান শস্যশ্যামল ও বিস্তৃত গোচারণক্ষেত্র থাকার দরুন নানা গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ পশু-চারণ করিতে ঐ অঞ্চলে যায় এবং আশ্বিন মাসে আবার ফিরিয়া আসে।

২৯শে জুন। আজ কালামের পথে উট্‌রোট্‌ নামক গ্রামে আসিলাম। উট্‌রোট আসিতে পথে তিনটি কাঠের পুল পার হইতে হইয়াছিল। এই পথের একটি বেগবতী নদীর নাম বাল্দ্রা। উট্‌রোটের কাছাকাছি আসিয়া আমি আর একটি কাঠের পুল পার হইলাম। এই নদীটির নাম গাব্রিয়াল। সোয়াত নদীর স্রোতোধারা এই পথেই বহিয়া চলিয়াছে।

এখান হইতে যে পথ ধরিলাম তাহা যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি বিপদসঙ্কুল। কামাল হইতে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত পথ ভাল ছিল, তারপর পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। অধিত্যকা প্রদেশ ও গিরিশ্রেণী ঘন বনশ্রেণীতে আচ্ছাদিত। এত বড় জঙ্গল, এত দীর্ঘ তরুশ্রেণী আমি আর কোথাও দেখি নাই। এখানে

রান্‌জরো* গাছের সংখ্যা খুবই বেশী। এই গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। পেশোয়ারে ইহার এক একটি গাছ ১৫০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। তা ছাড়া কোহিস্থানের এই সমুদয় অধিত্যকাপ্রদেশে আখ্‌রোট, বাদাম, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শস্যের মধ্যে ভূট্টা, যব, গোধূমের চাষও খুব হয়।

কালাম গ্রামটি খুব বড়। এই গ্রামে প্রায় ১,০০০টি বাড়ী ও একটি মসজিদ আছে। এখানে প্রায় কুড়িটি জলযন্ত্র আছে যব ও গোধুম ইত্যাদি ভাঙ্গাইবার জন্য। গ্রামের লোকেরা অর্থশালী। প্রত্যেকেরই অনেক গাভী আছে। ইহারা প্রচুর পরিমাণে ঘৃত পেশোয়ারে রপ্তানি করিয়া আশানুরূপ অর্থলাভ করিয়া থাকে।

গাব্রিয়াল নদী এক বিশাল বরফক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীর উভয় তীরবর্ত্তী অধিত্যকাভূমে গুজর জাতীয় পশুপালকদের ও কৃষকদের বাস। ইহারা খুব পরিশ্রমী। চাষবাস করিতেও যেমন দক্ষ, তেমনি পশুপালনেও ইহারা বিশেষ পটু। মাখন, ঘৃত, দধি ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনেও ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

আমাদের দুই দিন উট্‌রোটে থাকিতে হইয়াছিল। তুষার

* The Royal or Black Pine.

পাতের জন্য গিরিপথ এমনভাবে তুষারাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে পথ চলা ছিল অসম্ভব।

১লা জুলাই। উট্‌রোট ছাড়িয়া যে পথ পাইলাম তাহাকে পথ বলা চলে না। বন্ধুর শিলাকীর্ণ গিরিবর্ত্ম, তাহা আবার হাঁটু পর্য্যন্ত সুগভীর বরফে ঢাকা। অতি কষ্টে পথ চলিতে হইয়াছিল।

২রা ও ৩রা জুলাই। এই দুই দিন ২।৩ মাইলের বেশী পথ চলিতে পারি নাই। ৩রা জুলাই সন্ধ্যার একটু আগে লামুতি নামক গ্রামে আসিলাম। এ সময়ে কোহিস্থানের নানা প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমার সঙ্গের খাদ্য-দ্রব্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল। যে গ্রামেই খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিতে গিয়াছি, সেখানেই কিছু কিনিতে পারি নাই। ভুট্টা, ময়দা, চাউল কিছুই কিনিতে পারি নাই। চাউল টাকায় আড়াই সের হিসাবে বিক্রয় হইত।

এইভাবে সামান্য দুই একখানি রুটি খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে। জিয়ারাতে আমি ও আমার সঙ্গী দুইজনে দুই খানি মাত্র রুটি খাইয়াছিলাম। তৃতীয় দিন অনাহারে কাটাইতে হইয়াছিল।

৭ই জুলাই। অনাহারে কি করিয়া দুর্গম গিরিপথে অগ্রসর হওয়া যায়? তবু এইখানে থাকিয়া অনাহারে থাকা অপেক্ষা কালামের দিকে চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে একজন

গুজার কৃষক কয়েকটি গোরু, মহিষ এবং ছয়টি পাঁঠা লইয়া যাইতেছিল। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি পাঁঠা কিনিয়া একটি নিভৃত স্থানে গিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিলাম। সেখানে কোন জনপ্রাণীকেই দেখিতে পাইলাম না। আমরা আমাদের খাবার উপযোগী মাংস রান্না করিয়া একখানি রুটি দুইজনে ভাগ করিয়া মাংস সংযোগে খাইতেছি, এমন সময় কি জানি কোথা হইতে একদল কঙ্কালসার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাদের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করিল। আমরা যে পর্য্যটক এবং আমরা যে দুইদিন যাবৎ কিছু খাইতে পারি নাই, সেকথা তাহাদিগকে বলিলাম। কিন্তু এই বুভুক্ষু কঙ্কালসার ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া মনের মধ্যে ক্লেশ বোধ করিলাম এবং তাহাদিগকে কিছু মাংস দিয়া বাকী মাংস যত্নসহকারে পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গের একজন ভৃত্যকে দিলাম। তারপর কালামের দিকে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চারিদিক ঢাকা পড়িয়াছিল, তখন একটি গ্রামের পাশে মধ্যম গোছের একটি মসজিদ দেখিতে পাইলাম। আমরা সকলে রাত্রিটা সেখানে কাটাইব স্থির করিলাম। মসজিদের ইমামের নিকট হইতে কিছু গোধূম চড়া দামে কিনিলাম। রাত্রিতে রুটি তৈয়ারী করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলাম। সকাল বেলা দেখিলাম যে আমাদের সযত্নে সংগৃহীত মাংস চুরি হইয়াছে।

কালামে চারদিন থাকিলাম। এখান হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, আর একজন সঙ্গীর পায়ে ক্ষত হওয়ায়ও একদিন বেশী ছিলাম, কিন্তু তাহার পায়ের ক্ষত না সারায় তাহাকে পরে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

১২ই জুলাই। আমরা যে উট্‌রোট্, কালাম, উশু প্রভৃতি গ্রামের কথা বলিয়াছি, এই গ্রাম কয়টি যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহা খি-কোহিস্থান নামে পরিচিত। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে উশু আসিলাম। উশু নদীর তীরে উশু গ্রাম। লোকমুখে শুনিলাম উশু হইতে কানা নামক স্থান পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে সেই পথটি পর্ব্বত গাত্রস্খলিত বিশাল তুষারস্তূপে অবরুদ্ধ হইয়াছে। সিতু নদের পথে এইরূপ হিমশিলার পতন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৩ই জুলাই। আমরা সদলে আজ উশু ছাড়িয়া অগ্রসর হইলাম। রাত্রিতে একটি চৌরাস্তার মোড়ে তাঁবু ফেলিলাম। একদল গুজার কৃষক ও তাহাদের দলবল সহ ও পশুপাল সহ এখানে আসিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিল। তাহারা আমার সহিত আসিয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিল। আমি কেন এখানে আসিয়াছি, কি আমার উদ্দেশ্য, কোথায় যাইব, সব জানিয়া লইল। লোকগুলি বেশ সরল

প্রকৃতির। তাহাদের নিকট কাস্‌গরের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল যে তুষারপাতের জন্য সেদিকের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, আরও ২০।২৫ দিনের পূর্ব্বে সেদিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না। কাশগরের দিকে যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া সে পথে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

১৮ই জুলাই। উশু গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উশু নদীর তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই দিকে দুর্গম গিরিশ্রেণী। নদী কোন কোন স্থানে ৫০ হাতের বেশী চওড়া নহে। নদীর বাম তীর ধরিয়া এক মাইল পর্য্যন্ত পথ। ক্রমশঃ পথটি বরফাবৃত গিরিশিখরের দিকে চলিয়াছে। আমরা তুষারাবৃত নদীটি পার হইয়া উহার দক্ষিণ তীরে আসিলাম। আমি নদীর একটি শাখা অবলম্বন করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। এইবার ক্রমশঃ উচ্চ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথম অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত পথ তেমন দুরারোহ নহে, কিন্তু ক্রমশঃই দুরারোহ পর্ব্বতপথে অগ্রসর হইতে হইল। পথ তুষারাবৃত। পা পিছলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমরা পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিলাম, তবু পিচ্ছিল তুষারাচ্ছন্ন পথে পদযুগল স্থির করিয়া পদক্ষেপ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পায়ে মোজা ছিল। ভৃত্যেরা পায়ে পটি জড়াইয়া লইল। দুই একটি ক্ষুদ্র গুল্ম, বা খর্ব্বাকৃতি তরু ব্যতীত গাছপালা

কোন চিহ্নই ছিল না। আরও অর্দ্ধ মাইল অতি কঠিন দুর্গম চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমরা একটি হ্রদের তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম।

হ্রদটি ৩০০।৪০০ ফিট প্রশস্ত হইবে এবং দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ৯,০০০ হাজার ফিট। এই হ্রদ হইতে পালেসার নামক একটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হ্রদটির কোন দিকেই কোন নদীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। হ্রদটি বরফাবৃত ছিল। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও নির্ম্মল নীলাভ সলিলরাশি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আমরা হ্রদের কাছে যখন আসিয়াছিলাম তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে রাত্রির মত বিশ্রাম করিবার স্থান কোথাও নাই। এই তুঙ্গ গিরিশিখরে, তুষারাবৃত হ্রদের তীরে জনমানবের কোনও চিহ্ন নাই। সঙ্গে এমন জ্বালানি কাঠ নাই যে রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে পারি। সঙ্গীয় লোকেরা এই দুঃসহ ক্লেশের জন্য মাঝে মাঝে নানাভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এই বিরাট বরফ-ক্ষেত্রে কোন আশ্রয় নাই, আর অনাবশ্যকভাবে কোলাহল করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিলেও কোন সুফল হইবে না। আজ উন্মুক্ত আকাশতলে বরফক্ষেত্রেই নিশা যাপন করিতে হইবে। তাহাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করিলে কি হইবে? আমি

[illegible]গকে বলিলাম, বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কোনও লাভ নাই, [illegible]নরূপে আমরা এই গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারি, [illegible]শ্চয়ই কোথাও না কোথাও লোকালয়ের সন্ধান মিলিবে।

[illegible] বলিল, রাত্রির এই গভীর অন্ধকারে কোথাও অগ্রসর সম্ভবপর নহে। তাহাদের কথা যে অমূলক তাহা নহে। [illegible]ময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, দূরে হ্রদের উত্তর দিকে কৃষ্ণ গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। আমি সঙ্গীদিগকে দেখাইলাম এবং সেই পথে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি [illegible]বিষ্ট শৈল দেখিলাম, তাহার কোথাও তুষার নাই। দুই ছোট ছোট গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে থাকায় স্থানটিও নিরাপদ। সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমাদের সঙ্গে যে [illegible]ছিল তাহার দ্বারা রুটি ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তৃপ্তির [illegible]ভোজন করিলাম। বাহিরে তুষারপাত হইতেছিল, কিন্তু [illegible]দিকে গিরি-প্রাচীর এবং ঘনসন্নিবিষ্ট কয়েকটি শিলা উপরে আচ্ছাদনের মত সৃষ্টি করায়, আমরা নিরাপদ্ [illegible]গলাম। পরদিন বেলা ৮টার সময় ঘুম ভাঙ্গিল।

[illegible] জুলাই। গিরি[illegible]হের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া [illegible] চলিতে চলিতে এমন একটি [illegible] হইয়া [illegible] নিম্নে [illegible]

অবস্থিত। কোন্ পথে কিভাবে নিম্নের অধিত্যকা প্রদে
অব .বণ করা যায় এই হইল চিন্তার বিষয়। আমি চারিদি
... করিতে লাগি াম, যদি কোনও পথ মিলে। উশু হই
... দের সঙ্গে যে কুলিরা আসিয়াছিল তাহারা বলিল
আমরা কেবল একটি উপায়ে নীচে নামিতে পারিব। এই
বরফক্ষেত্র ... মুখে ঢালু হইয়া চলিয়া গিয়াছে শুধু উত্তর উ
যদি সার বাঁধিয়া বসিয়া অর্থাৎ একজনের পর আর এক
এইভাবে পর পর বসিয়া যদি নীচের দিকে যাই তাহা হই
অতি ... নীচে নামিতে পারিব। উশুর কুলিরা একজনের প
গার একজন ... বসিয়া পা ছড়াইয়া দিল এবং হস্তস্থিত
বল্লমের ... বরফক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া নীচে নামিতে
গিল ... তারা এমন দ্রুতগতিতে নীচে নামিতে লাগি
যে কিছুক্ষণ পর তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া
না। আমি এবং আমার সঙ্গী সকলের শেষে এ
... নামিলাম। অনভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ বেগ পাই
... তবু ... সহিত নীচে নামিয়
... লাম।

এখানে আসিয়া ... পাইলাম। উ
... তে আনীত কুলিরা ... সিন্ধু নদে
... র সহিত ... গিরি

হইয়াছে। দুই দিনের [illegible] গেলে পর আমরা সিন্ধুনদের স্রোতোধারা অবলম্বন করিয়া [illegible] সুখে অগ্রসর হইতে পারিব। সিন্ধুনদ হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশে প্রায় ৫০০ পাঁচশত মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ নাঙ্গা পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

আমাদিগকে উত্তর কুলিরা বলিল যে ঘীজার বা গীজার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কট অবলম্বন করিয়া কাশগর যাওয়া এখন অসম্ভব। স্থানীয় লোকদের ইহা অপরিজ্ঞাত নহে যে, এই পথে মানুষ এখনও যাতায়াত করে না। আরও এক মাইল পথ চলিতে চলিতে অপর একটি নদী পাইলাম। অদূরবর্ত্তী তুষার [illegible] এই নদীটির উৎপত্তি। নদীর পার দিয়া পথ। আমার দৃঢ় সঙ্কল্প [illegible] যে যেরূপেই হয় সিন্ধুনদের উৎস-সন্নিধানে পৌছিব। কিন্তু এই পথ ধরিয়া মাত্র দুই মাইল পথ [illegible] সর হইয়া দেখিলাম,—পথ বরফাবৃত। সে পথে অগ্রসর [illegible] মানুষের সাধ্যাতীত। সম্মুখে দেখিতে পাইলাম তুঙ্গ [illegible] শ্রেণী তু[illegible] মুকুট শিরে [illegible] সার বাঁধি[illegible] আছে। সিন্ধুনদের [illegible] কোথায় [illegible] সঙ্কটের [illegible] দিয়া [illegible] গিয়াছে, [illegible] [illegible] বোধ করি[illegible] নীরব [illegible] গিরিশ্রে[illegible]

পদনিম্নে বরফাবৃত অবরুদ্ধ ভাঁর সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ভীমকান্ত হিমালয় মনপ্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সম্পূর্ণ